ISSN 1605-7023

একাদশ বর্ষ সংখ্যা

কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

# বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

একাদশ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক-১৪১৩



## সম্পাদনা পর্ষদ

| | |
|---|---|
| মোঃ আব্দুস সালাম খান | চেয়ারম্যান |
| সৈয়দ মাহবুব হাসান | সদস্য |
| জিশান আরা আরাফুন্নেছা | সদস্য |
| হোসাইন জামিল | সদস্য |
| মুহাম্মদ হারুন চৌধুরী | সদস্য |
| মোঃ আশরাফ হোসেন | সদস্য |
| মোঃ মাহামুদ-উল-হক | সদস্য |

সম্পাদকঃ বণিক গৌর সুন্দর



**বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**

**সাভার, ঢাকা**

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, একাদশ বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক ১৪১৩
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 11th Year Issue, Kartik, 1413
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

প্রকৃত প্রকাশকাল : বৈশাখ-১৪১৬/এপ্রিল-২০০৯

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : ৭৭১০০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www.bpact.org

**গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ -এর ঠিকানা**

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

---

*বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।*

# সূচিপত্র


নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কতিপয় আইন: একটি পর্যালোচনা ১
**মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার**

প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থায় রাজার ভূমিকা ১৭
**ড. তরুণ কান্তি শিকদার**

বাংলাদেশে ভোটাধিকার: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ২৯
**অদুদ রায়হান**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা ৪৫
**মোহাম্মদ আবু মুসা**

ইসলামী অর্থব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা ৫৯
**মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন**
**এ কে এম মতিনুর রহমান**
**মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন**

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের অবস্থান ও মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা ৭৭
**মোহাম্মদ রেজাউল করিম**

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কতিপয় আইন: একটি পর্যালোচনা

*মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার**

**Abstract :** *It is needless to mention that violence against women is not a phenomenon in Bangladesh or in developing countries only. Rather it is a common feature in developed countries also. Bangladesh, likewise some committed countries is putting tremendous efforts continuously on curtailing violence against women and children. Along with diversified initiatives to make people more sentilized through education and motivational campaign alongwith enactment and enforcement of legal and policy measurer the govt. can claim to be a pioneer addressing violence against women. Despite criticism from some corners, especially on the enforcement status of legal provisions, it is indeed mentionable that some forms of violence especially through acid throwing, trafficking has turned up in a greater extent in recent years. However, the success of the comprehensive effort has narrowed down some how due to misuse of some of the laws by some people. The present article aims at critically analysing important provisions of some laws relating to combating violence against women. In some cases references have been given on inter and intra dependency and consistency among some provisions of different laws. The writer confined himself in the narrowed scope and reviewed only some of the criminal special laws related to VAW. However, a few recommendations have been incorporated in the discussion.*

## ভূমিকা

নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণ বা নারী নির্যাতন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের সমাজ নিয়ে একটি নেতিবাচক ধারণা জন্মে অনেকের মনেই, মনের অগোচরে। আমরা কারণ খুঁজি—কেন এ নির্যাতন? এ জন্য দায়ী কি শুধুই শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ধর্মীয় কুসংস্কার, শারীরিক পার্থক্য? তাছাড়া নারীর প্রতি এ সহিংসতা কি শুধু আমাদের মত উন্নয়নশীল সমাজেই ঘটছে? তাহলে কেন ইংল্যান্ডের পুলিশ প্রতি মিনিটে একটি কল পায় গৃহাভ্যন্তর-নির্যাতন থেকে উদ্ধারের জন্য যার ৮১ শতাংশই পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন? কেন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতি ২৩ সেকেন্ডে একজন নারী ধর্ষিত হয়? কেন অষ্ট্রেলিয়ায় ১৫ সেকেন্ডে গড়ে একজন নারী তার পুরুষ সঙ্গী কর্তৃক নিগৃহিত হয়? তাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার হার কিংবা ধর্মীয় কুসংস্কার তো এ পরিস্থিতির সমার্থক নয়[১]।

---

* পরিচালক (উপ-সচিব) আইএমইডি, ঢাকা

১ ইংল্যান্ড–Economic & Social Research Council's Programme on Violence; Royal Holloway, 2000; দক্ষিণ আফ্রিকা–Rape Crisis Cape Town, 1998; অষ্ট্রেলিয়া–UN Study on the World's Women, 2000।

নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের দেশে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু আইন সম্পূর্ণরূপে নারীর প্রতি নৃশংসতা রোধকল্পে প্রণীত, কতিপয় আইনের কিছু ধারায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার কতিপয় আইন রয়েছে যার মাধ্যমে নারীর প্রতি নৃশংসতা প্রতিরোধের পরোক্ষ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীর অধিকার ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে প্রণীত ৪৭টি আইনের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হল। উক্ত তালিকা থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রণীত কিংবা সংশোধিত ৩টি আইন যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ নিয়ে এ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে দণ্ডবিধি ১৮৬০ নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

## দণ্ডবিধি ১৮৬০

### সর্বজনিন দণ্ডবিধি

'দণ্ডবিধি' নামটি দেখেই প্রশ্ন জাগে এটি একটি সুনির্দিষ্ট আইন কিনা যদিও দণ্ডবিধির ১নং ধারায় এটিকে আইন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজে যত ধরনের অপরাধ অর্থাৎ যা করা বা না করা আইনে নিষিদ্ধ তাই যদি অপরাধ হয় তবে সে সমস্ত অপরাধের ধরন ও তার সাজা 'দণ্ডবিধিতে' সংকলিত হয়েছে। সে হিসেবে এটি অপরাধসমূহের একটি সংকলন। এ অবস্থায় একটি দেশে বা সমাজে যত ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় বা হতে পারে তার পূর্ণাঙ্গ সংকলনই হওয়া উচিত দণ্ডবিধি। সমাজের রীতিনীতির বা আচার ব্যবহারের, বিজ্ঞানের নব নব্ আবিস্কার, আধুনিক কলাকৌশল, বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাত্রা বৃদ্ধি—সবকিছুর বিবেচনায় অপরাধের প্রকৃতি, মাত্রা, পরিবর্তিত হতে পারে এবং তা হচ্ছেও। সুতরাং দণ্ডবিধি সংশোধন হতে পারে এবং হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ আইন, স্থানীয় আইন, জরুরী আইন বা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আইন পৃথকভাবে সংকলিত/প্রণীত করে এবং এমনকি দণ্ডবিধিতে সংকলিত অপরাধ ও তার সাজাকে অকার্যকর করে দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য ও স্পিরিট দুর্বল ও এর অঙ্গহানি করা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে অনেকের। তাদের মতে সমাজের সকল অপরাধ এবং তার দণ্ড একমাত্র দণ্ডবিধিতেই সংকলিত হওয়া উচিত।

### কতিপয় ধারা

প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে প্রণীত দণ্ডবিধিতে নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তাদেরকে শোষণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য কতিপয়

ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কালের বিবেচনায় সে সময় প্রবর্তিত এ বিধানগুলো খুবই অগ্রসরমান চিন্তার পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা যায়। নারী অপহরণ এবং হরণ (ধারা ৩৫৯-৩৬৬ এবং ৩৬৭-৩৬৯), পাচার, (৩৬৬এ-৩৬৬বি) শিশু পাচার/ক্রীতদাস (৩৭০-৩৭৪), ধর্ষণ (৩৭৫-৩৭৬), শ্লীলতাহানী (৩৫৪ ও ৫০৯), বিবাহ (৪৯৩-৪৯৮), গর্ভপাত (৩১২-৩১৬) প্রভৃতি ধারাগুলো দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নারী অধিকার রক্ষা এবং নারী নির্যাতন রোধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। তবে এ কথাটাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সুনির্দিষ্টভাবে নারী প্রসঙ্গ উদ্ধৃত না থাকলেও দণ্ডবিধির অন্যান্য ধারায়ও নারীরা প্রতিকার পেতে পারেন।

## নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

### প্রেক্ষাপট

দণ্ডবিধি বা অন্যান্য আইনে বিক্ষিপ্তভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিন্যস্ত বা অবিন্যস্তভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন বিধান থাকলেও ১৯৮৩ সালে প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা (নিবর্তক শাস্তি) শীর্ষক একটি আইন পাশ করা হয়। আইনটি এ দিগন্তে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় একটি ভিন্ন ধারার প্রবর্তক হিসেবে। ১০টি ধারা বিশিষ্ট এ আইনটিতে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড ছিল বিধায় সে সময়ে সাড়া জাগায়। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আইনটির পর্যাপ্ততা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলে এর সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ আইনটি বাতিল করে ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটি। তুলনামূলক বিচারে এ আইনটি অধিক প্রায়োগিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে ২৯টি ধারা ছিল। তাছাড়া এই প্রথম শিশু সংক্রান্ত মারাত্মক ও স্পর্শকাতর অপরাধগুলো এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করে তুলনামূলক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়। সমাজের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার প্রেক্ষাপটে পুনরায় প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নতুন আইনের। সর্বশেষ ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি উক্ত সময়ের ৮ নং আইন হিসেবে যুগান্তকারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ জারী করা হয়। এটি নতুন আইন যা ১৯৯৫ সালের নারী নির্যাতন (বিশেষ বিধান) এর সংশোধন নয় বরং ঐ আইনটি বাতিল করে এটি জারী করা হয়। এ আইনটিতে মোট ধারা রয়েছে ৩৪টি।

### ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য

এ আইনটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে অপরাধীর কারাদণ্ড/মৃত্যুদণ্ডের সাথে যুগপৎভাবে অর্থদণ্ড আরোপ, অর্থদণ্ডের টাকা ক্ষতিপূরণ

হিসেবে ভিকটিমের বা তার ওয়ারিশদের প্রদান, অপরাধীর বর্তমান সম্পদ না থাকলে ভবিষ্যৎ সম্পদ হতে অর্থদণ্ডের অর্থ আদায়, ভিকটিমের ছবি বা পরিচয় সংবাদ বা গণ মাধ্যমে প্রকাশ না করা, রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের ব্যবস্থা, বিরতিহীনভাবে একটানা প্রতি কার্যদিবসে বিচার কার্য পরিচালনা, স্বল্পতম নির্ধারিত সময়ে বিচার সমাপ্ত করা, ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, পুলিশী হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে পুলিশের বিরুদ্ধে জেল জরিমানার বিধান, তদন্তকারী কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার বা ট্রাইবুনালের জবাবদিহি ইত্যাদি ।

আইনটির ইতিবাচক দিক প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে আইনটিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে অনেক অপরাধের ক্ষেত্রে। এমনকি নারী দেহের স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ ৩টি অঙ্গে (মুখমণ্ডল, স্তন, যৌনাঙ্গ) দাহ্য, বিষাক্ত, বিস্ফোরক পদার্থ নিক্ষেপের ফলে বিকৃত বা নষ্ট করার জন্য আলাদাভাবে অপেক্ষাকৃত কঠোর সাজার অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যপকতা রোধকল্পে এবং এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের নিরীখে সরকার ও সমাজের দায়বদ্ধতা এবং চাহিদার প্রেক্ষাপটেই আইনের আওতায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

ফৌজদারী আইনের আওতায় বিচারিক কার্যক্রম কিংবা ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা/দৃষ্টান্তের আলোকে জামিন প্রদান ব্যবস্থাকে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কিংবা শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা, অপরাধ প্রবনতা হ্রাসকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা প্রাথমিক এবং কার্যকরী ব্যবস্থা (Tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে নিরিখে জামিনের কড়াকড়ি কিংবা জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে অতি সতর্কতার বিধানটি সাধুবাদ পেতে পারে। যদিও এর প্রায়োগিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যেই জনমনে নেতিবাচক ধারণার উদ্রেক হয়েছে।

**দণ্ডবিধির সংশোধন**

আইনটির ৩ ধারায় স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য আইনের সাথে বৈপরিত্বের বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এ আইনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । ফলে দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৯-৩৬৯, ৩৭২-৩৭৩, ৩৭৫-৩৭৬ বা অন্যান্য ধারায় বর্ণিত অপহরণ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে এ আইনের ৫, ৬,৭, ৯ ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে। দণ্ডবিধির বর্ণিত ধারাগুলো অদ্যাবধি বিলুপ্ত বা অকার্যকর করা না হলেও বাস্তবে তার কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য, ভুল বুঝাবুঝি বা অসতর্ক প্রয়োগের সম্ভাবনা

দুরীভূত করার লক্ষ্যে দণ্ডবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত বহু অপরাধের ক্ষেত্রেই সময়ের প্রয়োজনে এহেন বিশেষ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বা আংশিক অকার্যকর করা হয়েছে, কিন্তু দণ্ডবিধি সে অনুসারে সংশোধন করা হয়নি।

## ফৌজদারী কার্যবিধি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২৫ ধারামতে অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী অনুসৃত হবে যতটুকু এ আইনের সাথে ভিন্নরূপ হয় ততটুকু ব্যতিরেকে। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা আমলে নেয়ার এখ্তিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হলেও এ ক্ষেত্রে অপরাধ আমলে নেওয়ার এখ্তিয়ার সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের, যার বিচারক জেলা ও দায়রা জজগণের অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নিযুক্ত হন। এ ক্ষেত্রে আমলী আদালত সরাসরি ট্রাইবুনাল। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগ পত্র/চূড়ান্ত রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারা মতে আমলী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করবেন না সরাসরি আমলী ট্রাইবুনালে প্রেরণ করবেন তা স্পষ্ট নয়। তদুপরি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিযোগ পত্র গ্রহণ বা বর্জন কিংবা আরো তদন্ত/পুনঃ তদন্তের আদেশ দেবার এখতিয়ার না থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের করণীয় কি তাও স্পষ্ট নয়। তদ্রুপ পুলিশ এজাহারভুক্ত, সন্দেহযুক্ত বা গ্রেফতারী পরোয়ানা-মূলে গ্রেফতারকৃত আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করবে কিনা এবং প্রেরণ করলে এ আইন অনুসারে জামিনের শুনানীর এখতিয়ার বহির্ভূত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক করণীয় কি তাও অত্র আইনে উল্লেখ নেই বিধায় অস্পষ্টতার/ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

## সংবাদ মাধ্যম

পুর্বেই বলা হয়েছে যে এ আইনের দুটি বিশেষ এবং ইতিবাচক দিক হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধে অপেক্ষাকৃত কঠোর শাস্তির বিধান এবং মৃতুদণ্ড কিংবা কারাদণ্ডের সাথে অর্থদণ্ড যোগ করে শাস্তির বিধান। আইনের ১৪ ধারা মতে সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ না করে সংবাদ ছাপানোর সুযোগ দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয়, এ বিধান লংঘনকারীদের শাস্তির বেলায় কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে, যা অন্যান্য ধারার সাথে সঙ্গতিহীন। আরো লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বৎসর এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের বিচারে এটি একদিকে অন্য ধারার

সাথে সঙ্গতিহীন অন্যদিকে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর ভবিষ্যত সামাজিক মান-মর্যাদা ও অধিকার ধ্বংসকারী সংবাদ মাধ্যমকে ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনে এ বিধান ছিল না। ভিক্টিমের পরিচয় গোপন রাখা সম্বলিত নতুন ধারণার অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে এ ধারায় ইতিবাচক সংযোজন ঘটেছে ধরে নিলেও শাস্তির বিধান যথোপযুক্ত নয় বিধায় এর পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

## ধর্ষণজনিত জন্মগ্রহণকারী শিশু

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ -এর ১৩ ধারায় ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণকারী শিশু সম্পর্কে যথার্থ বিধান রাখা হয়েছে যা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। ২০০৩ সনের সংশোধনীর পূর্বে বিধানটি ছিল এ রকম যে সন্তানটি বিকলাঙ্গ না হলে ধর্ষণের ফলে জন্মগ্রহণকারী পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিয়ে পর্যন্ত ভরণপোষণ ধর্ষণকারী বহন করবে। বাস্তবিক কারণে এ বিধানটি যথোপযুক্ত ছিল না। ধর্ষণের পরবর্তী মামলা দায়ের, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান, মামলার বিচার সমাপ্তি এবং ধর্ষকের বর্তমান বা ভবিষ্যত সম্পদ হতে তা আদায় করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার যথেষ্ঠ সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় সহজেই ধরে নেয়া যায় যে তা বাস্তবসম্মত ছিল না। ২০০৩ সালের সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র কর্তৃক আপাতত বহন করার এবং ধর্ষক প্রমাণিত/চিহ্নিত/নিশ্চিত হবার পর তার নিকট থেকে যথাযথ পদ্ধতিতে আদায় করার বিধান রাখা হয়েছে—যা অধিক বাস্তবসম্মত। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সন্তানটির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে এভাবে যে, সন্তানটি তার মা বা বাবা বা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকার লাভ করবে। এর ফলে এ ধরনের শিশুর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিচিতি লাভের অধিকার নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার আওতায় আনা উচিত তা হচ্ছে ধর্ষকের বর্তমান বা ভবিষ্যত সম্পদের উপর ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণকারী শিশুর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। ধর্ষক চিহ্নিত/পরিচিতি নিশ্চিত হবার সাথে সাথে রায়/আদেশ প্রদানকারী ট্রাইবুনাল এ মর্মে ডিক্রী জারী করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের যথোপযুক্ত সংশোধনপূর্বক তার সাথে এর সমন্বয় সাধনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

এখানে একথা বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী সন্তানের ভরণপোষণ নির্বাহের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা জেলা প্রশাসনের অনুকূলে যথাযোগ্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন যার ব্যবস্থা অদ্যাবধি নেয়া হয়নি। আশা করা যায় অন্তত বিধি দ্বারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

## অপরাধ তদন্তের সময়সীমা

অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ২০০০ সালের মূল আইনের ১৮ ধারায় যে বিধান ছিল ২০০৩ সালে তা পরিবর্তন করে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে ধৃত হওয়া বা না হওয়ার উপর তদন্তের সময়সীমা ব্যতিক্রম করা হয়েছে অর্থাৎ অপরাধ সংঘটনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতে নাতে ধরা পড়লে তদন্তের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ১৫ দিন অন্যথায় ৬০ দিন ধার্য করা হয়েছে। এ বিশেষ ব্যবস্থা সার্বিক বিচারে যুক্তিসঙ্গত বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু উক্ত ধারার ২ উপধারাটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেখানে নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত সমাপ্ত করা সম্ভব না হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজেই অতিরিক্ত ৩০ দিন সময় বর্ধিত করে ট্রাইব্যুনাল বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। এ সংশোধনী দ্বারা তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত তদন্তের সময়সীমার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া ফৌঃকাঃবিঃসহ অন্যান্য প্রচলিত বিধি-বিধানের সাথেও এ নিয়ম সঙ্গতিহীন। এক্ষেত্রে তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজনে ট্রাইবুনালের অনুমতিসাপেক্ষে সময় বৃদ্ধির বিধান অধিক যুক্তিসংগত। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এ আইনে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট কোথায় পেশ করতে হবে তাও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত নেই।

## বিচার প্রক্রিয়া

আইনের ২০ ধারা মোতাবেক মামলার বিচার কার্য প্রতি কর্মদিবসে একটানা (মূলতবী বিহীন) ১৮০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল সমাপ্ত করবে। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করে মামলা নিষ্পত্তি করতে না পারলে ৩১ক ধারার বিধান অনুসারে ব্যর্থতার কারণ লিপিবদ্ধ করে ৩০ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করবে। এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি(দের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে দু'টো বিষয় প্রণিধানযোগ্য, প্রথমত, মামলা নিষ্পত্তির সময় শেষ হওয়ার পর একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ত্রিশ দিন সময় প্রদান প্রয়োজনের তুলনায় অধিক। দ্বিতীয়ত, পেশকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রাখা হলেও মামলার পরিণতি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছুই উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে মামলায় অভিযুক্ত আসামী(দের) সম্পর্কে করণীয় কোন দিক নির্দেশনাও এই আইনে নেই।

## আইনের বিধি

ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান যা এ আইনে অন্তর্ভুক্ত তাকে এ আইনের ৩ ধারায় প্রাধান্য দেওয়া হলেও এ আইনের অনেক ধারার বিধানাবলী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আইন জাররি পর প্রায় সাত বছর অতিবাহিত হলেও এবং ইতোমধ্যে ২০০৩ সালে মূল আইনের সংশোধন হবার পরও আইনের ৩৩ ধারামতে বিধি প্রণীত না হওয়ায় একদিকে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে।

## আরও কতিপয় অপরাধ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সমাজে প্রায়শই ঘটছে তা এ আইনে উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এ সকল অপরাধ কিংবা তার শাস্তি এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নারী বিশেষ করে টিনএজ মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, নারীদের ব্ল্যাকমেইল করা, ভয়ভীতি/প্রলোভন বা মিথ্যা আশ্বাস/প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারীদের দিয়ে ব্লু-ফিল্ম বা অশ্লীল ছবি ইত্যাদি তৈরী করা, নারীদের জোরপূর্বক মাদকদ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ানোর চেষ্টা করা, মাদকদ্রব্য পরিবহন, মজুতকরণ বা বিক্রি করার ক্ষেত্রে জোরপূর্বক তাদের ব্যবহার করা কিংবা গৃহ-অভ্যন্তরে সংঘটিত নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধ বা তার শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলে আইনটি আরো বিস্তৃত ও কার্যকর হত।

## আইনটির অপপ্রয়োগ

এ আইনের অপরিহার্যতা, যথোপযুক্ততা এবং কার্যকারী ভূমিকা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। আর এ আইনের ব্যবহার বা প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে। ১৮৭৩ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ সালে সংশোধন করা হয়। কিন্তু ২০০০ সালের এ আইনটির ২০০৩ সালেই বড় ধরনের সংশোধন করা হয় যা প্রকারান্তরে আইনটির বহুল প্রয়োগের ইঙ্গিত প্রদান করে। তাছাড়াও অনুমান করা হয় একমাত্র যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-এর পর এই আইনের প্রায়োগিক ঘনত্ব বেশি। এ দিক থেকে আইনটি নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে একটি যথার্থ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তবে যে বিষয়টি অধুনা বেশি আলোচিত, তা হচ্ছে এর অপপ্রয়োগ। শুরু থেকেই এর অপপ্রয়োগের অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০০১ সালের ১ জুলাই থেকে ২০০২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৭ হাজার ৩৬২টি মামলার বিচার হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩১টি মামলায় ৬৭৮ জন আসামীর শাস্তি হয়। মামলাগুলোয় আসামী ছিল ২২ হাজার ১৭৩ জন। ২১ হাজারেরও বেশি আসামীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি (মহিলা সমাচার)। তুলনামূলকভাবে কঠোর সাজা, জামিন প্রদানে অতিরিক্ত বিচার বিবেচনার/সতর্কতার বিধান, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পরিবর্তে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অপরাধ আমলে নেয়া বা জামিনের শুনানী নেয়ার এখতিয়ার কিংবা আইনের অধীনে বিধি প্রণীত না হওয়ায় আইনী অস্পষ্টতা ও কার্যপদ্ধতির রূপরেখার অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে এর অপপ্রয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২১১ ধারামতে মিথ্যা মামলা দায়েরের সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড এর ন্যায় এ আইনের ১৭ ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে সাজার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে আইনটির অপপ্রয়োগ কমে যেত বলে ধারণা করা যায়।

কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় এ আইনের গুরুত্ব, মামলা দায়েরের ঘনত্ব, জামিনের শর্তাবলী ইত্যাদি বিবেচনায় এর অপপ্রয়োগকল্পে এবং অভিযুক্তের হয়রানি হ্রাসকল্পে মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সাজার মেয়াদ বৃদ্ধি, জামিনের শর্তাবলী শিথিল, জামিনের শুনানী এবং অপরাধ আমলে নেবার এখ্তিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। উল্লেখ্য, এ আইনের অপব্যবহার রোধে তথা শত্রুতাবশত বা প্রতিশোধমূলকভাবে অভিযুক্তকে হয়রানী বা তার মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রবণতা রোধকল্পে নির্বাহী আদেশে আসামীদের গ্রেফতার করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের মতামত/পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আইনটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং এর অন্তর্গত যুগান্তকারী পদক্ষেপ/বিধানসমূহ আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে । তবে আইনটির অপপ্রয়োগের প্রবণতা হ্রাস করতে না পারলে ক্রমান্বয়ে এর আকর্ষণ ও উপযোগ এবং সর্বজনিনতা হ্রাস পেতে পারে।

### এসিড সংক্রান্ত আইন-২০০২

**প্রেক্ষাপট:** দণ্ডবিধিতে বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা মানুষের জীবনের ক্ষতি সাধন করার শাস্তির বিধান রয়েছে (ধারা ২৮৪)। অন্যান্য আইনেও বিশেষত ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ক্ষয়কারী, দহনকারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন নারী বা শিশুকে আঘাত করার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তথাপি এসিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম এসিড দ্বারা মহিলা আক্রান্ত হবার রিপোর্ট পাওয়া যায় এবং অতঃপর এসিড দ্বারা আক্রান্তের এ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সূত্রমতে ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে এসিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মোট ৮৬৭ জন অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৭৯ জন। ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩৪ জন,

২০০২ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪৮ জন। বিদ্যমান আইনের আওতায় এসিড সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা যখন রোধ করা যাচ্ছিল না তখনই ২০০২ সালের ১৭ই মার্চ একই সাথে এতদসংক্রান্ত ২টি আইন জারি করা হয়: (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন) এবং (খ) এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ (২০০২ সনের ২ নং আইন)। উভয় আইন এসিড সংক্রান্ত হলেও এদের উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র, পরিধি, শাস্তি এবং পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে। উল্লেখ্য, পরবর্তী বছরগুলোতে এসিড আক্রান্ত ঘটনা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং ২০০৩ সালে ৪১০ জন, ২০০৪ সালে ৩২২ জন এবং ২০০৫ সালে ২৬৯ জনে দাঁড়ায়।

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ এবং এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২—উভয় আইনই আক্ষরিক অর্থে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে প্রণীত ও জারি করা হয়নি। আইনের সর্বত্র লিঙ্গভেদে 'ব্যক্তি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে আইন দু'টোর পরিধি ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে আমাদের সামাজিক বাস্তবতার নিরীখে এ আইন দু'টো নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ করার আবশ্যকতাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে- এ কথা বলা যায়। পক্ষান্তরে, পুরুষ নয় বরং নারীরাই এ আইনে প্রধানত সুরক্ষা পাচ্ছেন বলেও সহজেই মন্তব্য করা যায়।

## এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২

**উদ্দেশ্য:** এসিড সংক্রান্ত অপরাধ রোধকল্পে স্বভাবতই এসিডের প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। এ আইন প্রধানত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসিডের আমদানী, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসাবে এসিডের অপব্যবহার রোধ এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ জারি করা হয়েছে।

**কাউন্সিল ও কমিটি:** স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে কো-চেয়ারম্যান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য-বিশিষ্ট জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে যার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এসিড আমদানী উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করা। তাছাড়া, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্য-বিশিষ্ট জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে এসিডের উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়ন জেলা কমিটির অন্যতম

দায়িত্ব। অধিকন্তু জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য এসিডের আমদানী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছেন।

**ইতিবাচক দিক:** এ আইনটির ইতিবাচক কয়েকটি বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে, যার অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণমূলক, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ও সহায়তামূলক বা কল্যাণমূলক। যেমন এ আইনে এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও আইনী সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা, এসিডের কুফল এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার ও কল্যাণ তহবিল পরিচালনা ইত্যাদির লক্ষ্যে ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আক্রান্ত/নির্যাতিত ব্যক্তির বা তার উত্তরাধিকারীকে অর্থদণ্ডের অর্থ হতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এসিড দ্বারা কৃত অপরাধ অমানবিক ও মারাত্মক বিবেচনায় এ আইনে অপরাধসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একদিকে জনমনে এর ভয়াবহতা তুলে ধরার জন্য অন্যদিকে জনগণকে বিশেষত নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এ আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধসমূহকে আমলযোগ্য, আপোষ-অযোগ্য এবং জামিনের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ আইনের অধীন কৃত অপরাধের দণ্ডের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড একই সাথে প্রযোজ্য হলেও অপরাধ সংঘটনে গৃহ বা যানবাহন ব্যবহার করতে দেয়া (ধারা ৩৮) বা লাইসেন্স ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে (ধারা ৩৯) কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে কোন একটি দণ্ড প্রদানের বিধান রচিত করে উভয়বিধ দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যায়। তবে ৪২ ধারানুসারে পুনরায় কৃত একই অপরাধের জন্য দিগুণ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাটি যথোপযুক্ত। এ আইনের পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে বা চিকিৎসা লাভের তথ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বা চিকিৎসকের উপর অর্পণ করা হয়েছে।

**বিধি প্রণয়ন:** এই আইনের ৫১ ধারায় সরকারকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং উক্ত বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এ ধরনের বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যতিক্রমভাবে একটি গাইড লাইন প্রদান করা হয়েছে, তবে আইনটি জারির প্রায় ৪ বছর পরও বিধি প্রণীত না হওয়ায় এর প্রয়োগে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ আইনে বিভিন্ন কমিটি গঠন, কমিটির তহবিল প্রতিষ্ঠা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এসিড আমদানী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা (লাইসেন্স মঞ্জুর, নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিল) এসিড

বাজেয়াপ্তকরণ/আটককরণ পদ্ধতি, এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন জরুরী। উক্ত আইনের ১৬ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে লাইসেন্স প্রদান ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রম বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।

## এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২

**প্রেক্ষাপট:** এসিড দ্বারা সংঘটিত অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের লক্ষ্যে এ আইনটি জারি করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ -এ দাহ্য, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধসমূহ দমনের বিধান রয়েছে। সে দিক থেকে এ আইনটি জারির প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা এ প্রশ্ন অনেকের। তবে এসিড দ্বারা অপরাধ সংগঠনের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ আইনটির প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত হয়ে পড়েছে। আরো একটা বিষয় স্মরণযোগ্য যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন শুধুমাত্র নারী ও শিশুদের প্রতি নৃশংসতা রোধকল্পে প্রণীত হয়েছে। অন্যদিকে এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০০ প্রণীত হয়েছে লিঙ্গভেদে সকলকে এসিড দ্বারা সংঘঠিত নির্যাতন ও ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য। বিভিন্ন সূত্রের তথ্যমতে ক্রমবর্ধিষ্ণু এসিড আক্রান্তের হার ২০০৩ সাল থেকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে যা অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে এ আইন জারির যথার্থতা তুলে ধরেছে।

**ইতিবাচক দিক:** এ আইনটিও একটি বিশেষ আইন হিসেবে জারি করা হয়েছে। এসিড দ্বারা সংঘটিত অপরাধ গুরুত্বপূর্ণ, ভয়াবহ ও স্পর্শকাতর বিষয় বিধায় এ আইনে বেশ কিছু ইতিবাচক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিধানসমূহ হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত কঠোর সাজার বিধান, যুগপৎ কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান, ক্ষতিগ্রস্তকে অর্থদণ্ডের অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা, দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পদ বা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে রেখে যাওয়া সম্পদ হতে অর্থদণ্ডের অর্থ আদায়, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তের জন্য স্বল্প সময় দান, প্রতি কর্মদিবসে একটানা বিচার কার্য পরিচালনা করা, নব্বই দিনের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করা, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জবানবন্দি গ্রহণের বিধান, সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার গাফিলতির জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, মেডিকেল অফিসার কর্তব্যে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

**অস্পষ্টতা:** তবে এ আইনেও কতিপয় বিষয় সুস্পষ্ট নয়। যেমন অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষেত্রে বা জামিনের বিষয় ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা, পুলিশ আসামী/ধৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করলে সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় কি, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ পত্র কিংবা চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর ম্যাজিস্ট্রেটের

করণীয় কি, ১৬ ধারা মোতাবেক ৯০ দিনে বিচার কার্য সমাপ্ত না হলে মামলা কিংবা আসামী সম্পর্কিত বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। এ আইনে ভিকটিম মহিলা হলে সেক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে ভিক্টিমের ছবি ও পরিচয় প্রকাশে বিধি নিষেধ না থাকায় মহিলা ও শিশু ভিক্টিমের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান ভুলুণ্ঠিত হতে পারে এবং তারা বিচার প্রার্থনা করতে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৮ ধারার অনুরূপ এ আইনের ১১ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে আসামী/অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময় হাতে নাতে ধৃত হলে তদন্তের জন্য তুলনামূলক কম সময় প্রদানের বিধান করা যেতে পারে।

এ আইনটি জারির পর প্রায় সাড়ে ৬ বছর অতিবাহিত হলেও আইনের ৩০ ধারা মোতাবেক বিধি প্রণীত না হওয়ায় আইনটি বাস্তবায়নে অস্পষ্টতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। এ আইনের আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা কোথাও কোথাও অস্পষ্ট। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারামতে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করলে জামিনের শুনানী নেয়ার এখতিয়ারবিহীন ম্যাজিস্ট্রেট কি করবেন সেটি উল্লেখ নেই। কিংবা উক্ত ধৃত ব্যক্তিকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের কোন দিক নির্দেশনা আইনে নেই। তদ্রুপ কার্যবিধির ১৭৩ ধারামতে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় কি তাও উল্লেখ নেই। মামলা আমলে নেয়া, জামিনের শুনানী প্রভৃতি বিষয়গুলো ট্রাইবুনালের এক্তিয়ার বিধায় এবং জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলে এ আইনটিও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মত অপপ্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

## গ্রন্থনির্দেশ


১. এ.কে আজাদ (২০০৩), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, নিউ ওয়াসী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা-১০০০ ।

২. Gender in Law (1998): Edited by Tahmina Ahmed & Md. Mainul Ahsan Khan, Adtam Publishing House, Dhaka.

৩. GOB, The Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898), Ministry of Law & Justice, Dhaka.

৪. GOB, Penal Code (Act X IV of 1860) Ministry of Law & Justice, Dhaka.

৫. Handbook for the Magistrates (2005), Edited by M. Matiur Rahman Ph.D, Bangladesh Public Administration Training Centre, Dhaka.

৬. Shafiqul Haque, Md. Women's (Human) Rights and Gender based Violence Against Women in Bangladesh. Paper submitted to a seminar on 10-6-2003 at BPATC, Savar, Dhaka.

৭. Taslima Monsoor (1999), From Patriarchy to Gender Equiry. The University Press Limited. Dhaka.

৮. প্রথম আলো (২০০৬), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপপ্রয়োগ চলছেই, তারিখ ২৫-১১-২০০৬, মিডিয়াষ্টার লিঃ ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ।

৯. এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (২০০৬), ঢাকা ।

**পরিশিষ্ট 'ক'**

Some Enactments related to gender—

০১. The Penal Code 1860

০২. The Divorce Act 1869

০.৩ The Evidence Act 1872

০৪. The Special Marriage Act 1872

০৫. The Christian Marriage Act 1872

০৬. The Married Women's Property Act 1874

০৭. The Guardians and Wards Act 1890

০৮. The Prisons Act 1894

০৯. The General Clauses Act 1897

১০. The Code of Criminal Procedure 1898

১১. The Foreign Marriage Act 1903

১২. The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act 1928

১৩. The Succession Act 1925

১৪. The Child Marriage Restraint Act 1929

১৫. The Hindu Law Inheritance Act 1929

১৬. The Suppression of Immoral Traffic Act 1933

১৭. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937

১৮. The Bengal Maternity Benefit Act 1939

১৯. The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

২০. The Vagrancy Act 1943

২১. The Orphanage and Widows Home Act 1944

২২. The Public Health (Emergency) Provision Ordinance 1944

২৩. The Hindu Marriage Disabilities Removal Act 1946

২৪. The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act 1946

২৫. The State Acquisition and Tenancy Act 1950
২৬. The Hindu Widows Remarriage Act 1956
২৭. The Muslim Family Law Ordinance 1961
২৮. The Minimum Wages Ordinance 1961
২৯. The Employment of Labour (Standing Order) Act 1965
৩০. The Factories Act 1965
৩১. The Bangladesh Passport Order 1973
৩২. The Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1974
৩৩. The Dhaka Metropolitan Police Ordinance 1976
৩৪. The Chittagong Metropolitan Police Ordinance 1978
৩৫. The Dowry Prohibition Act 1980
৩৬. The Government Servant (Conduct) Rules 1979.
৩৭. The Emigration Ordinance 1982
৩৮. The Family Courts Ordinance 1985
৩৯. The Khulna Metropolitan Police Ordinance 1985
৪০. The Rajshahi Metropolitan Police Ordinance 1992
৪১. The Jatio Nari Unnoyan Niti 1997
৪২. The Nari O Shishu Nirjaton Daman Ain 2000
৪৩. The Prevention of Acid Crime Act 2002
৪৪. The Acid Control Act 2002
৪৫. The Speedy Trial Ordinance 2002.
৪৬. The Births and Deaths Registration Act 2004.
৪৭. The Special Prevelize for Convicted Women Act 2006.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থায় রাজার ভূমিকা

ড. তরুণ কান্তি শিকদার*

***Abstract***: *In this paper the reader will get an apparent view of an ancient India king, his creation and the qualities of an individual who were able to be a king. From the time immemorial we were familiar with the monarchy and democracy to rule over the country. At the very outset the concept of the society we found that people elected their leader to rule over the society. The paper aims at focusing on the role of a king in the ancient times. The king played a vital and important role in his kingdom. He was the prime and chief component of seven parts of the state. This paper will mainly discuss the quality of a king in the ancient India. Kautilya has defined four types of qualities of a king i.e, qualities of a person easily approachable, qualities of intellects, qualities of energy and personal excellences. These were the basic qualities of a person who intended to be a king. In that time personal excellences were highly admirable to a benevolent king. It is also said that the king must administer the Rod (danda) properly. Who cannot administer rod properly will destroy soon, improper application of rod is also the cause of destruction of a king and his kingdom. The paper would be helpful to know the heritage of ancient India that may help us to build a healthy nation.*

**ভূমিকাঃ** সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু হয়েছে মানুষের জোটবদ্ধ বা যূথবদ্ধ জীবন যাত্রা। শুধু মানুষ নয়—সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণী একত্রে দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে স্বগোত্রীয় অন্যদের সাথে। এই চলার পথে তারা খুঁজে নেয় সহযাত্রী এবং সম-অনুভূতি সম্পন্ন জীবন্ত বান্ধবকে। মহান স্রষ্টার অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। পবিত্র কোরান শরীফে মানুষকে আশরাফুল মাকলুকাত"[১] বা সৃষ্টির সেরা জীব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ তার মস্তিষ্ক। চলার পথে মেধা ও মননের সাহায্যে মানুষ সৃষ্টির সকল প্রাণীকে বুদ্ধি বলে পরাভূত করে অর্জন করেছে শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাণী জগতের অন্যান্য জন্তু ও প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মানুষ যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছে তেমনি প্রতিযোগিতা চলেছে নিজস্ব রেস বা পরিমণ্ডলের মধ্যে। আর এই পারদর্শিতায় যে জাতি যত বেশি অগ্রণী তারা তত বেশি উন্নত জাতি হিসেবে মানব সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানুষের মাঝে এই প্রতিযোগিতা বিশ্ব মানব সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছে। গড়ে উঠেছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা। মিলেছে নানা মত ও পথের সন্ধান। এমনি ধারাবাহিকতায় নানান ভাষাগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম মিশরের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ও ভারতীয় উপমহাদেশের মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার

---

* অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খুলনা।

১. সুরা বনি ইসরাইল পারা ১৫, আয়াত নং- ৭০।

আর্য সভ্যতা। প্রাচীনত্বের দিক থেকে সমসাময়িক না হলেও এ দুটি সভ্যতা যে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আর্য সভ্যতা। আর্য সভ্যতার হাজারো দিক রয়েছে। রয়েছে অগণিত গবেষণা, নানা আঙ্গিক। এখানে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা বাতুলতা মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শাসন ব্যবস্থার দু-একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবন্ধের শুরুতেই একটি বিষয়ে দৃক্‌পাত করা হয়েছে যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রকৃতপক্ষে, এই সামাজিক যূথবদ্ধতা তৈরী হয়েছিল মানুষের বিশাল প্রকৃতির কাছে অসহায়ত্বের কারণে। কি ভাবে কি পরিবেশে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যায় কালক্ষেপণ না করে আমরা যদি মানব সৃষ্টির লগ্ন থেকে বিবেচনা করি তাহলে অনেক বিতর্ক সম্ভবত পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে। কারণ প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে মানুষের শক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। আর তাই প্রকৃতিকে জয় করে নিজেকে যোগ্যতর থেকে যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করতে হয়েছে কৌশল। এভাবেই পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। সত্যদর্শী মানুষকে এজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজার হাজার বছর। পার করতে হয়েছে এক একটি অন্ধকার অধ্যায়, শুরু হয়েছে নব নব যুগের। এভাবেই সৃষ্টির উন্মাদনায় আবির্ভূত হয়েছে নতুন রূপ, নতুন আলোকে। ক্রমে দ্রুত বর্ধনশীল মানব জাতি বহুধা বিভক্ত হয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে স্থানান্তরিত হয়েছে। গড়ে তুলেছে সমাজ। প্রয়োজনের তাগিদে সূচিত হয়েছে কৃষিকাজ, পশুপালনসহ ব্যবসা বাণিজ্যের নানাবিধ পেশা। আর এ সকল পেশার মানুষকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কোন এক সময় দলের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে যার ক্রমপরিণতি আজকের রাষ্ট্রীয় দর্শন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা।

বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও মতের পাশাপাশি নানা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে বিভক্ত। এ অবস্থায় উন্নীত হতে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পুরাতনকে অবলম্বন করে সৃজিত হয়েছে নতুন ব্যবস্থা। আবার এই নতুনও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে পুরাতনে রূপলাভ করছে। এর মধ্যে কিছু অভ্রান্ত সত্য লুক্কায়িত রয়েছে আমাদের চারপাশে যা কখনোই পুরাতন নয়। প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয়ে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকছে আমাদের মাঝে। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কর্ণধারদের নৈতিকতা ও তাদের কর্মকাণ্ডের উপর সামান্য আলোকপাত করা। একই সাথে অতি প্রাচীনকালে আমাদের এ সভ্যতা কিভাবে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল সেসম্পর্কে তুলনামূলক কিছু আলোচনা। বর্তমানে যে দুর্নীতি আমাদের অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে তার কারণ কি? মানুষ কি সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এ সকল দুর্নীতির সাথে পরিচিত না সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনে দুর্নীতির থাবা ক্রমশ রূঢ় হয়ে আমাদের বেঁধে ফেলছে। এমনি অসংখ্য প্রশ্ন আজ মানুষের মনে

আর্য সভ্যতা। প্রাচীনত্বের দিক থেকে সমসাময়িক না হলেও এ দুটি সভ্যতা যে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আর্য সভ্যতা। আর্য সভ্যতার হাজারো দিক রয়েছে। রয়েছে অগণিত গবেষণা, নানা আঙ্গিক। এখানে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা বাতুলতা মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শাসন ব্যবস্থার দু-একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবন্ধের শুরুতেই একটি বিষয়ে দৃক্‌পাত করা হয়েছে যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রকৃতপক্ষে, এই সামাজিক যূথবদ্ধতা তৈরী হয়েছিল মানুষের বিশাল প্রকৃতির কাছে অসহায়ত্বের কারণে। কি ভাবে কি পরিবেশে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যায় কালক্ষেপণ না করে আমরা যদি মানব সৃষ্টির লগ্ন থেকে বিবেচনা করি তাহলে অনেক বিতর্ক সম্ভবত পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে। কারণ প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে মানুষের শক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। আর তাই প্রকৃতিকে জয় করে নিজেকে যোগ্যতর থেকে যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করতে হয়েছে কৌশল। এভাবেই পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। সত্যদর্শী মানুষকে এজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজার হাজার বছর। পার করতে হয়েছে এক একটি অন্ধকার অধ্যায়, শুরু হয়েছে নব নব যুগের। এভাবেই সৃষ্টির উন্মাদনায় আবির্ভূত হয়েছে নতুন রূপ, নতুন আলোকে। ক্রমে দ্রুত বর্ধনশীল মানব জাতি বহুধা বিভক্ত হয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে স্থানান্তরিত হয়েছে। গড়ে তুলেছে সমাজ। প্রয়োজনের তাগিদে সূচিত হয়েছে কৃষিকাজ, পশুপালনসহ ব্যবসা বাণিজ্যের নানাবিধ পেশা। আর এ সকল পেশার মানুষকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কোন এক সময় দলের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে যার ক্রমপরিণতি আজকের রাষ্ট্রীয় দর্শন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা।

বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও মতের পাশাপাশি নানা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে বিভক্ত। এ অবস্থায় উন্নীত হতে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পুরাতনকে অবলম্বন করে সৃজিত হয়েছে নতুন ব্যবস্থা। আবার এই নতুনও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে পুরাতনে রূপলাভ করছে। এর মধ্যে কিছু অভ্রান্ত সত্য লুক্কায়িত রয়েছে আমাদের চারপাশে যা কখনোই পুরাতন নয়। প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয়ে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকছে আমাদের মাঝে। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কর্ণধারদের নৈতিকতা ও তাদের কর্মকাণ্ডের উপর সামান্য আলোকপাত করা। একই সাথে অতি প্রাচীনকালে আমাদের এ সভ্যতা কিভাবে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল সেসম্পর্কে তুলনামূলক কিছু আলোচনা। বর্তমানে যে দুর্নীতি আমাদের অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে তার কারণ কি? মানুষ কি সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এ সকল দুর্নীতির সাথে পরিচিত না সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনে দুর্নীতির থাবা ক্রমশ রূঢ় হয়ে আমাদের বেঁধে ফেলছে। এমনি অসংখ্য প্রশ্ন আজ মানুষের মনে

পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এ সব প্রশ্ন উপস্থাপনের পূর্বে পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমাদের সুদূর অতীতের কিছু কথা জানাতে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের রাজনীতি দর্শন তথা নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্যের নাম অনেকেই শুনেছেন যিনি কৌটিল্য নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' যা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র নামে সুবিদিত। গ্রন্থের নামকরণ অর্থশাস্ত্র হলেও প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি রাজনীতি তথা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এক অনন্য গ্রন্থ।

প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে পাঠককে কৌটিল্য ও অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া আবশ্যক। কৌটিল্য বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন যেমন-[২] চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, বাতস্যায়ন, মল্লনাগ, চনকাত্মজ, দ্রামিল,পক্ষিলস্বামিন, অঙ্গুল, বরাণক ও কাত্যায়ন ইত্যাদি। কথিত আছে, কুটিল স্বভাব (Crocked mind) বিশিষ্ট বলে তিনি কৌটিল্য নামে খ্যাতিলাভ করেন। বিশাখদত্তের অন্যতম নাটক মুদ্রারাক্ষসে কৌটিল্যের কূটনীতির এক উজ্জ্বল অধ্যায় চিত্রিত হয়েছে। এই নাটকে বিশাখদত্ত কৌটিল্যের চরিত্রকে এক অসাধারণ কূটনীতিবিদ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের চরিত্রকে অপ্রধান হিসেবে এবং কৌটিল্যের চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক অসমসাহসী যোদ্ধা, পরাক্রমশালী রাজা ও অমিত তেজস্বী শাসক হিসেবে পরিচিত। নাটকে দেখা যায় সাধারণ মানুষ কৌটিল্যের নাম শুনে ভয়ে আৎকে উঠছে। নাটকে সূত্রধার বলছেন,[৩]

> কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষ যেন"।
>
> ক্রোধাগ্নৌ প্রসভমদাহি নন্দবংশঃ। (১/৭)
>
> (এই সেই কুটিলমতি কৌটিল্য যিনি তার রোষাগ্নিতে নন্দ বংশকে অচিরে ধ্বংস করেছেন)।

তবে কৌটিল্যের মত প্রখ্যাত রাজনীতি বিশারদকে জানার জন্য অর্থশাস্ত্রই অনন্য গ্রন্থ। অর্থশাস্ত্রই তাঁর চিন্তা ধারার অন্যতম ফসল। যদিও অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি কৌটিল্যের একক রচনা নাকি এটি সময়ের ধারাবাহিকতায় অসংখ্য ব্যক্তির চিন্তা চেতনার ফসল এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এমনকি তাঁর জন্ম-সন নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কোন গ্রন্থের লেখক ও গ্রন্থ পরিচিতি সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেননা তৎকালীন গ্রন্থকারগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে নিজকে প্রকাশে বিমুখ ছিলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পুঁথিসমূহের অধিকাংশ যথাযোগ্য সংরক্ষণের অভাবে প্রথম ও শেষের দিকের অধিকাংশ পাতা পাওয়া যায়নি। ফলে লেখক পরিচিতি সংগ্রহ করতে হতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি বা অন্যান্য

---

২। Sikder, Tarun Kanti, Crime and Punishment in ancient India a study of Kautilya, Manu and Yajnavalkya, a Ph.D thesis submitted to the Unversity of pune, Center of Advanced Study in Sanskrit (CASS), pune-7, Page-53, also in Unni, N.P, Published 1983, Page-3|

৩। বিশাখদত্ত, মুদ্রারাসম্ ,সংস্কৃত সহিত্যসম্ভার, নির্বাহী সম্পাদক, প্রসুন বসু, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩, পৃষ্ঠা- ৩৮২।

মাধ্যমিক উপাত্ত-উপকরণের মাধ্যমে। তবে বিভিন্ন এপিগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্তের ৩২১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে এবং অশোকাবর্ধনের ২৯৬ খৃঃ-পূর্বাব্দে রাজা হওয়া ও সিংহাসন আরোহণ নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয়।[৪] এসব তথ্যের সূত্র ধরেই কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র খৃষ্ট-পূর্ব ৩২১-৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখিত বলে গবেষকগণের অনেকেই একমত পোষণ করেন। বিভিন্ন সূত্রে তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিছু কিছু গবেষক কৌটিল্যের জীবনকাল তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বলে অনুমান করেন। অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে তৃতীয় খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কোন সময় এই অমর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[৫] তবে ১৯০৯ সনের পূর্বে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে শুধু লোকমুখে শোনা যেত এবং বিভিন্ন গ্রন্থে এর কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যেত। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে অর্থশাস্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯০৯ সালে মহীশুরের পণ্ডিত ড. আর শ্যাম শাস্ত্রী অর্থশাস্ত্রের প্রথম একটি সংস্করণ বের করেন। এই আবিষ্কার ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের নয়—বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও এক অনন্য-সাধারণ আবিষ্কার। বিপুলায়তন এই গ্রন্থের দুর্বোধ্য শব্দ চয়ন ও পরিশীলিত ভাব ও জ্ঞান গাম্ভীর্যের কারণে একে ভাষাবিদগণ গ্রন্থ না বলে একটি গন্থাগার হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন।

বুদ্ধ জাতকমালার তথ্য অনুযায়ী কৌটিল্য একপাটি দাঁত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যা ভবিষ্যৎ রাজা হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু তাঁর পিতা ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়ায় সন্তানের রাজা হওয়া পছন্দ করেননি। এজন্য তিনি জন্মলগ্নে পুত্রের সমস্ত দাঁত তুলে দেন। তবে কালক্রমে তিনি রাজা না হলেও তাঁর ভাগ্য তাঁকে রাজা তৈরীতে সাহায্য করেছিল। কারণ তিনিই ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অলিখিত প্রধানমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও গুরু। তিনিই বিশাল নন্দ বংশকে ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মৌর্য বংশের যে রাজবংশ পরবর্তীতে ১৩৭ বছর ভারতে রাজ্য পরিচালনা করে।[৬]

কৌটিল্যের লেখা প্রাপ্ত গ্রন্থ মাত্র চারটি- ১) ধাতু কৌটিলীয় ২) কৌটিলীয়ম্ ৩) চাণক্য রাজনীতি এবং ৪) অর্থশাস্ত্র। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্র ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের উপর গদ্যে লিখিত গ্রন্থখানি ১৫টি আলাদা বইয়ের আদলে লিখিত যা মূলগ্রন্থে অধিকরণ নামে পরিচিত। অধিকরণগুলি আবার বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত। সর্বমোট এই বিষয় সূচিতে ১৫টি অধিকরণ, ১৫০টি অধ্যায় ও ১৮০টি প্রকরণ এবং ৬০০০টি শ্লোক আছে।গ্রন্থটি পদ্যে লেখা হলে এতে সন্নিবেশিত

৪। Sikder, Tarun Kanti, Crime and Punishment in ancient India a study of Kautilya, Manu and Yajnavalkya, a Ph.D thesis submitted to the Unversity of pune, Center of Advanced Strdy in Sanskrit, pune-7, Page-53, also in Unni, N.P, Published 1983, Page-3|

৫। Ibid Page-53-54

৬। Ibid Page-53, also Sastri S.R. Evaluation of Indian polity, Nag publishers, Published 1977, P-VII

অক্ষরসমূহ দ্বারা ৬০৩২ অক্ষরবিশিষ্ট শ্লোক রচনা সম্ভবপর ছিল।[৭] এই সুবিশাল কলেবরে রাজনীতি তথা নীতিসার ও দণ্ডনীতির যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তার ব্যাপক আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়টির উপর প্রাচ্যের প্রাজ্ঞপরিষদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তা-ভাবনা কি ছিল তা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের প্রামাণ্য বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে সমাজ ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ও তার প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে রাজাকে স্রষ্টার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে রাজা ঈশ্বরের সৃষ্টি। একটি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করা হয় যে, পূর্বে কোন রাজা ছিল না। তখন সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে নানা বিবাদে জড়িয়ে পড়তে থাকে। শক্তিশালী লোক বা উচু পর্যায়ের মানুষ কর্তৃক ছোটরা নিগৃহীত হতে থাকে। ঠিক বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায়। তেমনি সমাজে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যাকে "মাৎস্যন্যায়" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বর স্বয়ং রাজা সৃষ্টি করেন। তিনি অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ঈন্দ্র এই অষ্ট দিকপালের সারভূত অংশগ্রহণ করে রাজার সৃষ্টি করেন। অতএব রাজা আট জন দেবদেবীর অর্জিত তেজ, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত বিধায় কেউই তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন না।[৮]

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকার এ বিষয়ে একমত পোষণ করলেও কৌটিল্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন প্রকৃতিতে যখন মাৎস্যন্যায় বিদ্যমান, সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ বিশৃংখলা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছিল ঠিক সেই সময় এই সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের নেতা নির্বাচন করেন। এই প্রক্রিয়াই এক সময় মনু বৈবস্বতকে সাধারণ মানুষেরা তাদের পালক, রক্ষক তথা রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। এজন্য বেদে মনুকে আদি পিতা বা পালক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই সর্বাংশে সমর্থন করছে। তাঁর মতে,

> "মাৎস্যান্যায়াভিভুতঃ প্রজা মনুং বৈবস্বতং রাজানং চকিরে। ধান্য ষট্‌ভাগং পন্য দশভাগং হিরণ্যং চাস্য ভাগ ধেয়ং প্রকল্পয়ামাসুঃ। তেনাভৃতা রাজানঃ প্রজানা যোগক্ষেমবহাঃ।"
>
> অতএব, রাজা শুধু জনগণের প্রতিনিধি নয়—তিনি ঈশ্বরেরও প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের পালক বা রক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর এজন্য জনগণ তাঁকে উৎপন্ন ধানের ছয় ভাগের এক ভাগ, অন্যান্য পণ্যের দশ ভাগের এক ভাগ নগদ অর্থ বা হিরণ্য কর হিসাবে প্রদান করবে।[৯]

---

৭। বসাক, রাধা গোবিন্দ, কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্ (১ম খণ্ড), ১.২.১৮ শে-াক, প্রকাশক, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স লি. ১১৯ লেলিন সরণী, কোলকাতা-১৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ-১৯৯৬ ইং।

৮। মনুসংহিতা, ৭.২-৭ শে-াক; তর্করত্ন, পঞ্চানন, সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত, অক্টোবর, ১৯৯৩।

৯। Kangle, R.P The Kautilaya Arthasastra, (Part-II) 1.13.4-9, Motilal Banarsidass publishers pvt. ltd. Reprint-1997.

রাজার এই যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। মনু বলেছেন, রাজা হবে নির্লোভ, প্রজাবৎসল। তিনি নিজেকে প্রজার সেবায় উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। রাজা যেহেতু বায়ু, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দেবতার অংশ দিয়ে তৈরী তাই এই সব দেবতারা যেভাবে মানুষের উপকারে আসে রাজাও তেমনি মানুষের সেবার জন্য সদা উন্মুখ থাকবেন। একইভাবে দুষ্টের দমন করা রাজার অন্যতম দায়িত্ব। মনুর মতে রাজা হচ্ছে- দণ্ডের ও পুরুষের প্রতীক। দণ্ডের প্রকৃত বাস্তবায়ন না হলে রাজত্ব স্থায়ী হয় না। আর এই দণ্ডনীতির প্রয়োগ হতে হবে যথার্থভাবে। দণ্ডের অতিমাত্রার প্রয়োগ এবং কম প্রয়োগ ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এজন্য বার বার বলা হয়েছে "যথার্থ দণ্ড" (যথার্থ দণ্ডঃ পূজ্যঃ)।[১০] দণ্ডের প্রয়োগ যথার্থ হলে কেউ রাজাকে অবজ্ঞা করতে পারে না। মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ১৭ নং শে-াকে রাজা ও দণ্ডকে একীভূত করে দেখা হয়েছে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে,

> স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
> চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ। (৭.১৭)
>
> (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্তা। ঋষিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্মের প্রতিভূস্বরূপ বলে গিয়েছেন)। মনুস্মৃতিতে আরো বলা হয়েছে, "আগুনে শুধু নিক্ষিপ্ত বস্তুকেই ধংস করতে পারে, কিন্তু রাজার রোষানলে পড়লে সে তার স্ত্রী পুত্র পরিজন ও সহায় সম্পদসহ ধ্বংস হয়ে যায়"।[১১]

রাজার গুণ সম্পদ নিয়ে অর্থশাস্ত্রের মণ্ডলযোনী নামক ৬ষ্ঠ অধিকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটি রাষ্ট্রের ৭টি উপাদান বা প্রকৃতি বা Component এর উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল বা সেনা) ও মিত্র। এই সাতটি প্রকৃতির মধ্যে রাজা ও তার অমাত্য বা মন্ত্রিপরিষদ বা সরকারি কর্মকর্তা রাজ্য পরিচালনায় অন্যতম ভূমিকা পালন করতো। রাজাই ছিল একটি রাষ্ট্রের মূল চাবিকাঠি। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয় রাজ্যের সকল উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব। এজন্য রাজাকে হতে হবে সর্বগুণে গুণান্বিত। কৌটিল্য রাজার গুণসমূহকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন। ক) আভিগামিক গুণঃ (Qualities one easily apporchable), খ) প্রাজ্ঞ গুণ ঃ (Qualities of intelect), গ) উৎসাহগুণ ঃ (Qualities of energy), ঘ) আত্মসম্পদ (Personal excellences)।

অর্থশাস্ত্রের এই গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

**ক) আভিগামিক গুণ: (Qualities one easily apporchable)—**[১২] এগুলোর উল্লেখযোগ্য হলো- ১) মহাকুলীন (born in a high family), ২) দৈবসম্পন্ন

১০। Ibid, 1.4.10.

১১। মনুসংহিতা শে-াক ৭.৯, তর্করত্ন, মহোপাধ্যায় পঞ্চানন, সম্পাদিত, মনুসংহিতা, প্রকাশক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলি-০৬, অক্টোবর- ১৯৯৩।

১২। Kangle, R.P, The Kautilaya Arthasastra, (Part-II) 6.1.1-3, Motilal Banarsidass publishers pvt. Ltd. Reprint-1997.

(endowed with good fortune), ৩) বুদ্ধিসম্পন্ন (intelligent), ৪) ধার্মিক (pious) এবং ৫) সত্যবাদী (truthful)।

**খ) প্রাজ্ঞ গুণ: ৮টি (Qualities of intelect)**[১৩] এগুলোর মধ্যে অন্যতম- ১) শুশ্রূষা (desire to Serve), ২) শ্রবণ (listening), ৩) গ্রহণ (learning) ও ৪) ধারণ (retention) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**গ) উৎসাহগুণ: (Qualities of energy)**[১৪]—১) শৌর্য (bravery), ২) অমর্ষণ (resentment), ৩) ক্ষিপ্রতা (quickness) এবং দক্ষতা (dexterity)।

**ঘ) আত্মসম্পদ (Personal excellences)**[১৫]—এ জাতীয় ২৭টি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে- ১) বাগ্মী (eloquent), ২) প্রগল্ভ (bold), ৩) স্মৃতিমান (endowed with memory), ৪) মতিমান (intelect), ৫) বলবান (strong), ৬) কাহারো দ্বারা কৃত উপকার ও অপকার সম্বন্ধে প্রতিকার বিধায়ক, ৭) আপদে ও প্রকৃতিতে সুবিনিয়োগকারী (able to take suitable action in calamities and in normal conditions), ৮) দীনজনের প্রতি সহনশীল (sympatic to the poor ), ৯) কাম, ক্রোধ, লোভ, স্তম্ভ (গর্ব), চাপল্য বর্জিত (devoid of illicit sex, anger, greed, stifness (pride), fickleness), ১০) দূরদর্শী -প্রভৃতি অন্যতম।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, উত্তর ভারতের মিথিলা নগরীতে খৃঃ পূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে আরো একজন প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রকার ছিলেন যিনি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর মূল্যবান শিক্ষা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ এখনো দায়ভাগ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে লার ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকে অনুসরণ করে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ৩০৯ ও ৩১০ নং শ্লোকে রাজার গুণাবলী বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে, রাজা হবেন বিশেষ উৎসাহ সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্যযুক্ত, সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘসূত্র (অবশ্য কর্তব্য কর্মের আরম্ভে এবং কর্মের সমাপনে আলস্যশূন্য), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরুষ (যিনি পরদোষ কীর্তনে রত নহেন), ধার্মিক, ব্যসনশূন্য, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা দণ্ডনীতি ও ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক, যজুঃ, সাম এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হবেন।[১৬]

---

১৩। Ibid, 6.1.4

১৪। Ibid, 6.1.5.

১৫। Kangle, R.P, The Kautilaya Arthasastra, (Part-II) 6.1.6,Motilal Banarsidass publishers pvt. Ltd. reprint 1997.

১৬। মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞোবৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ।।৩০৯
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমান দ্রোইপরুষস্তথা।
ধার্মিকোহব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শুরো রহস্যবিৎ।।৩১০
তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন, সম্পাদিত, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রকাশক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলি-০৬, ১৩৯৮ সন।

একজন রাজার এমনি অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলীর পাশাপাশি রাষ্ট্রের অবস্থান তথা তার রাজধানী বা দুর্গাদির অবস্থান সম্পর্কে বর্ণিত গুণাবলীকে 'জনপদ সম্পৎ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাজকোষ সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে রাজকোষ পূর্বরাজাগণ দ্বারা ও নিজ ধর্ম দ্বারা ন্যায়ানুসারে অর্জিত সম্পদ অর্থাৎ ধান্য ষড়ভাগ ও পণ্য শুল্ক দশভাগ দ্বারা শাস্ত্রবিহীতভাবে অর্জিত সম্পদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। রাজার ভাণ্ডার এতই রজত ও হিরণ্যগর্ভ হবে যা দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থায়ী বিপদ এবং অনায়তি (অর্থের ভবিষ্যৎকালীন অনাগম) সহ্য করতে সক্ষম হবে। এভাবে রাজার আরো গুণাবলীর মধ্যে অর্থশাস্ত্রে দুর্গ-সম্পদ, দণ্ড-সম্পদ, মিত্র-সম্পদ, অমিত্র-সম্পদ ইত্যাদি বিবেচিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের ৭টি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে যথা- স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল বা সেনা) ও মিত্র। এই সাতটিকে প্রকৃতিও বলা হয়। এই ৭টি প্রকৃতি রাজার সাথে এমনভাবে জড়িত যে এক একটি প্রকৃতি রাজার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাজার পরই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বাধিক গুরুত্ব বহনকারী প্রকৃতির নাম অমাত্য। কৌটিল্য অমাত্য অর্থে দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে বুঝিয়েছেন যথা- ধীসচিব বা মন্ত্রী এবং কর্ম-সচিব বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। অমাত্য নির্বাচনে রাজাকে অত্যন্ত ধীশক্তির পরিচয় দিতে হয়। কারণ রাজ্যের সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় এই অমাত্যগণের মাধ্যমে। তাই অমাত্য নির্বাচন ত্রুটিযুক্ত হলে রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মনুসংহিতায়ও রাজভৃত্যদের সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান হয়েছে। এদের নিয়োগের পূর্বে বার বার তাদের যাচাই করা ও বিভিন্ন সময়ে দণ্ড প্রদানের মাধ্যমে তাদের বশে রাখার বিষয় আলোচিত হয়েছে। মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ১২৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

> রাজ্ঞো রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
> ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।
>
> "রক্ষণার্থে নিয়োজিত রাজভৃত্যগণ অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হয়ে থাকে; অতএব সবিশেষ যত্ন সহকারে তাদের উপদ্রব হতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য।"

তাই এ সকল রাজ-কর্মচারীদের হাত হতে প্রজাদের রক্ষায় রাজাকে সদা জাগ্রত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

### অমাত্য নিয়োগ

অমাত্য নিয়োগ বা রাজকর্মচারী নিয়োগ বিষয়ে কৌটিল্যের মতামত আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে তৎকালীন অন্যান্য মুনি এবং আচার্যবৃন্দের সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে:

- আচার্য ভরদ্বাজের (দ্রোণাচার্য) মতে রাজা নিজের সহপাঠিদের মধ্য হতে অমাত্য নিয়োগ করবেন। কেননা তাদের মনোভাব ও কার্য-সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।
- আচার্য্য বিশালাক্ষ এর বিরোধিতা করে বলেছেন রাজার সহপাঠিরা বিদ্বেষবশত রাজাকে অবহেলা করতে পারে। তাই রাজা এমন লোককে অমাত্য নিয়োগ করবেন যিনি গুণ ও স্বভাবে রাজার সমান গুণসম্পন্ন।
- আচার্য পরাশর বলেছেন রাজা তাকেই অমাত্য পদে নিয়োগ দিবেন যিনি বিপদে পূর্বে রাজাকে সাহায্য করেছেন।
- তবে আচার্য্য পিশুন (নারদ) এই মতের বিরোধিতা করে বলেন এ ধরনের উপকারী ব্যক্তি রাজদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকতে পারে। তাঁর মতে, যে সব ব্যক্তির কর্মগুণে রাজকোষে অর্থাগম ঘটতে পারে তাদের কর্মের পরিধি অনুযায়ী অমাত্য পদে নিয়োগ দেওয়া সমীচীন।
- আবার আচার্য্য কৌনপদন্ত (ভীম) এই মত মানেন না। তিনি বলেন, অর্থাগমই রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মতে পুরুষানুক্রমে যারা রাজার বিশ্বস্ত অর্থাৎ রাজসেবায় অনুগত, বিপদে রাজাকে পরিত্যাগ করবে না এমন ব্যক্তিকে অমাত্য পদে নিয়োগ প্রদান করা উচিত।
- কিন্তু আচার্য্য ব্যাতব্যাধি (উদ্ধব) এই মত অবলম্বন করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে পুরুষানুক্রমিক অমাত্যরা রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে পারেন। ফলে রাজার পক্ষে নীতিশাস্ত্রবিদ নতুন লোককেই অমাত্য পদে নিয়োগ প্রদান করা উচিত। যাঁরা রাজাকে দণ্ডধর জ্ঞানে সদা ভীত থাকে।
- আবার আচার্য বাহুদন্তীপুত্র (ইন্দ্র) এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে নীতিশাস্ত্রে নিপুণ ব্যক্তি শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান কর্মে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় সফলকাম হবেন না। সুতরাং রাজা এমন ব্যক্তিকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করবেন যিনি সদ্বংশজাত, প্রজ্ঞাবান, শুদ্ধ, শুর ও স্বামীর প্রতি ভক্তিমান, কারণ গুণের প্রাধান্যই গ্রহণযোগ্য।[১৭]

কৌটিল্য উপর্যুক্ত সকল মনীষীদের সিদ্ধান্তগুলোকেই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁর মতে পুরুষের সামর্থ্য তার কার্য নিষ্পত্তির শক্তি দ্বারা নির্ধারিত। এই সকল অমাত্যগুণসমূহ বিবেচনায় রেখে দেশ, কাল ও কাজের স্বরূপ বুঝে রাজা যে কোন ব্যক্তিকে অমাত্য বা কর্মসচিবের পদে নিয়োগ দিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রী বা ধীসচিবের পদে নহে। মন্ত্রী পদে তাকেই নিযুক্ত করবেন যিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। অতঃপর কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেরে নবম অধ্যায়ে ৫ম প্রকরণে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রির গুণাবলীর কথা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে[১৮]—

১৭। Kangle R.P, The Kautilaya Arthasastra (Part-II), 1.8.1-27, Motilal Banarsidass publishers' pvt. Ltd. Reprint- 1997.

১৮। Ibid 1.9.1

১) জানপদ, ২) অভিজাত, ৩) চক্ষুষ্মান, ৪) প্রাজ্ঞ, ৫) দক্ষ, ৬) বাগ্মী, ৭) প্রগলভ (bold), ৮) প্রতিপত্তিমান, ৯) উৎসাহযুক্ত, ১০) প্রভাবযুক্ত, ১১) ক্লেশসহ, ১২) বলযুক্ত, ১৩) চাপল্যবর্জিত এবং ১৪) শত্রুতার অনুৎপাদক

এসব গুণরাজি যার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান তিনি ১ম শ্রেণীর অমাত্য বিবেচিত হবেন। যার মধ্যে এই গুণাবলীর এক চতুর্থাংশের কম আছে তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য এবং যার মধ্যে এই গুণগুলির অর্ধাংশ কম আছে তিনি অবর বা অধম শ্রেণীর অমাত্য বলে বিবেচিত হবেন।

অমাত্যগণের এ সকল গুণ রাজা তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান ও অনুমেয় জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে বা প্রমাণ করে রাজপদে নিয়োগ দান করবেন। অতঃপর প্রত্যেক অমাত্যের শুচি অশুচি পরীক্ষার জন্য ৪ প্রকার ছলনা বা উপধা এর প্রয়োগ করবেন—যা ধর্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা এবং ভয়োপধা নামে পরিচিত[১৯]।

১) ধর্মোপধা (ধর্ম বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনাপূর্বক পরীক্ষণ): রাজা রাজপুরোহিতকে কোন অযাজ্য ব্যক্তি অর্থাৎ নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞ করতে নির্দেশ দিবেন। তখন পুরোহিত রুষ্ঠ হয়ে যজ্ঞ করাতে অস্বীকৃত হলে তাকে স্বপদ হতে অপসারণ করবেন। তখন সেই তিরস্কৃত পুরোহিত গোপনে সত্রি নামক চর (গুপ্ত পুরুষ)'দের সহায়তায় রাজার নিকটবর্তী সকলের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে সচেষ্ট হবেন এই বলে যে রাজা অধার্মিক হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তাকে হত্যা করে বা অপসারণ করে অন্য কোন ব্যক্তি বা রাজার অন্য কোন ধার্মিক পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য সকলের মত আছে। শুধু আপনার মত পেলেই রাজাকে বধ করা যায়। তখন যদি সেই অমাত্য এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন তাহলে তিনি শুচি বা রাজভক্তিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। এই ছলনা পদ্ধতিই ধর্মোপধা।

২) অর্থোপধা (ধনলাভ বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনা পূর্বক পরীক্ষণ): এই পদ্ধতিতে সেনাপতিকে রাজা কোন অপূজ্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলবেন এবং সেনাপতি তা করতে অস্বীকৃত হলে তাকে পদচ্যুত করবেন। তখন অপমানিত সেনাপতি বিভিন্নভাবে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গুপ্তচরের দ্বারা অমাত্যদিগের নিকট বিপুল অর্থসহ লোভনীয় প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। তখন যেসব অমাত্য এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন তারা শুচি বলে পরিগণিত হবেন।

৩) কামোপধা (কাম বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনা): কোন পরিব্রাজিকা (ভিক্ষুকী) যিনি রাজার অন্তঃপুরের মহিষীগণের বিশ্বাসের পাত্রী ও তাদের দ্বারা সম্পূজিতা। তিনি অমাত্যগণকে বলবেন যে, রাজমহিষী আপনার খুবই অনুরক্ত এবং আপনাকে কামনা করেন। তিনি আপনার সমাগমের সব পথ স্থির করে রেখেছেন। এতে আপনার অর্থলাভও হবে। এ ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তিনি শুচি বলে পরিগণিত হবেন। এই পদ্ধতিই কামোপধা।

১৯। Ibid 1.10.1-19

৪। ভয়োপধা (ভয় প্রদর্শনপূর্বক ছলনা) : বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাজার বিশ্বাসভাজন কোন অমাত্য অন্যান্য অমাত্যগণকে একত্র মিলিত করবেন। তাদের নিকট এই মর্মে ভীতি উৎপাদন করবেন যে, রাজা তাদের অবরুদ্ধ করে ধন ও মান হতে অপসারিত করবেন। এ সময় রাজা কর্তৃক নিগৃহীত অন্যান্য অমাত্যগণকে দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে কথা বলবেন। এই রাজাকে সকলে পরাভূত করে শীঘ্রই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে রাজপদে বসানোর প্রস্তাব প্রদান করবেন। যিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন তিনিই শুচি।

এভাবে চার প্রকার উপধা প্রয়োগ করে রাজা তার অমাত্যগণের শুচিতা লাভ করবেন। এই চার প্রকার পদ্ধতির মধ্যে যারা ধর্মোপধা বিষয়ে শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের ধর্মস্থীয় (বিচারক) ও কন্টকশোধন (ম্যাজিস্ট্রেট) বিষয়ক কাজে নিযুক্ত করবেন। যারা অর্থোপধা বিষয়ে শুদ্ধ তাদের সমাহর্তা (রাজকর সংগ্রহকারী অধ্যক্ষ) ও সন্নিধাতা (রাজকোশ নিধানকরণে নিয়োজিত অধ্যক্ষ) পদে নিয়োগ দিবেন। যারা কামোপধা বিষয়ে শুদ্ধ তাদেরকে রাজার বাহ্য ও অভ্যন্তর বিহার সাধনভূত স্ত্রীলোক ও মহিষীদিগকে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করবেন। যিনি ভয়োপধা বিষয়ে শুদ্ধ তিনি রাজার সমীপবর্তী অর্থাৎ শরীর রক্ষা কাজে নিযুক্ত হবেন। যারা চার প্রকার উপধা বিষয়ে শুদ্ধজ্ঞানে বিবেচিত হবেন তারাই মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হবেন। আবার যারা সর্বপ্রকার উপধা বিষয়ে অশুচি বলে সিদ্ধ হয়েছেন তাদের খনি, দ্রব্যবন, হস্তিবন, ও নানা প্রকার কষ্টসাধ্য কাজ বা কারখানায় নিয়োগ দান করবেন। অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ এবং ভয় এর দ্বারা পরিশুদ্ধ ব্যক্তিই যোগ্যতা অনুযায়ী রাজপদে অধিষ্ঠিত হবেন। তবে কৌটিল্য সতর্ক করে দিয়েছেন—এই শুদ্ধি পরীক্ষায় রাজা কখনোই নিজেকে এবং পট্টমহিষীকে টেনে আনবেন না। আর অহেতুক কোন দোষরহিত কুলীন ব্যক্তিকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ করবেন না।

লক্ষণীয়, কৌটিল্য রাজ্য পরিচালনার কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাদের গুণাবলীর যে বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় বাস্তবে এমন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান লাভ করা দুরুহ ব্যাপার। সময়ের বিবর্তনে বর্তমান রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কারণ বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তির চেয়ে দলের অবস্থান বেশি দৃঢ়। দেশ পরিচালনা হয় নির্বাচনে বিজয়ী দলের রাজনৈতিক চিন্তাধারায়। সেখানে দলের প্রতিনিধি হিসেবে দলনেতা পদাধিকার বলে রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হন। এই দল বা দলনেতা নির্বাচনে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাও কতটুকু ত্রুটিমুক্ত সে কথা বিবেচনায় রাখা দরকার। কেননা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত দল ক্ষমতায় বসে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের গুণ প্রাধান্য পায় না। জনমত প্রতিফলিত হয়ে দলের রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোর উপর। আর নেতা নির্বাচনে বিশ্বে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পেশীশক্তি ও অর্থ একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

## উপসংহার

এই প্রবন্ধে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সুফল কুফল আলোচনা মুখ্য বিষয় নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিসত্ত্বা পরিমাপ করার জন্য কিছু নিয়ামক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। স্মরণ করার চেষ্টা দল মত সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে যে ব্যক্তির উপর এত বড় একটি দায়িত্ব বা ভার অর্পণ করা হচ্ছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে এ ভার বহনে সক্ষম কিনা ! যদি ভার বহনে সক্ষম না হন তাহলে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। দেশ ও জনগণ হবে বিপদগ্রস্ত। এজন্য কৌটিল্য রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল কর্ণধার রাজা ও তার অমাত্যবর্গেকে (ধীসচিব ও কর্মসচিব) বার বার পরীক্ষা করেছেন। রাষ্ট্রনায়কদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মান (মোহ), মদ ও মাৎমর্য এই ষড়রিপু দমন করে এক ঋষি পুরুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। নিজ ইন্দ্রিয়কে জয় করতে না পারলে রাষ্ট্রসেবা সম্ভব নয়। ইতিহাস ও পুরাণ থেকে তিনি অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন যে, যে সকল রাজা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও বিনষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, ভোজ বংশীয় দাণ্ডক্য নামক রাজা ও বিদেহাধিপতি করাল নামক রাজা কামবশত ব্রাহ্মণকন্যাকে পেতে ইচ্ছুক হওয়ায় অভিশপ্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হন। কোপবশত জনমেজয় রাজা ব্রাহ্মণের উপর বিক্রম প্রকাশ করে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। লোভের বশবর্তী হয়ে ইলানন্দন (পুরুরবা) এবং সৌবির দেশের রাজা অজবিন্দুও জনগণের উপর হতে অতিমাত্রায় ধন অপহরণ করায় বিনষ্ট হন। অভিমানবশত রাবণ পরস্ত্রী (সীতাকে) হরণ করে এবং দুর্যোধন পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে বিনাশপ্রাপ্ত হন।[২০] অতএব ষড়রিপুর দমন প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে কাম, ক্রোধ, ও লোভ দমন করতে না পারলে কোন ব্যক্তিই জীবনে সফলকাম হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বেও শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করায় অসংখ্য রাষ্ট্রনায়ক ও উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছেন; ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এমন নজির শুধু আমাদের দেশে বা উন্নয়নশীল দেশসমূহেই নয় উন্নত বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনায়ক পতিত হয়েছেন নিন্দিত হয়েছেন।

যে কোনও দেশের রাষ্ট্রনায়কের চিন্তাভাবনা আবর্তিত হওয়া উচিত তার জনসাধারণকে কেন্দ্র করে। একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের মূল উদ্দেশ্য প্রজার কল্যাণ সাধন। ব্যক্তিগত বা দলগত মত প্রতিষ্ঠা নয়। সেকারণেই কৌটিল্যে লিখেছেন—

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাংচ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্॥ [২১] —অর্থাৎ,

(প্রজার সুখে রাজা সুখী, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ, যা রাজার নিজের প্রিয় তা তার হিত নয়, বরং প্রজাবর্গের যা প্রিয় সেটাই রাজার প্রিয়।)

২০। Kangle, R.P, The Kautilaya Arthasastra, (Part-II) 1.6.1-12, Motilal Banarsidass publishers pvt. Ltd.

২১। Kangle, R.P, The Kautilaya Arthasastra, (Part-II) 1.19.5, Motilal Banarsidass publishers' pvt. Ltd. Reprint-1997. Reprint-1997.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# বাংলাদেশে ভোটাধিকার: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

অদুদ রায়হান*

**Abstract :** *It is an accepted notion all over the world that people is the source of ultimate power. To quote Abraham Lincoln they constitute a government of them, by them and for them. Adult franchise is the only way to execute the power of the people. This is true both in Bangladesh and about the rest of the world. The present paper aims at how the right was exercised before and after the partion in Pakistan, of which Bangladesh was a part till 1971. The paper looks into its exercise since the birth of Bangladesh till 11 January, 2007. The history begins in 1935 with the 'constiutional' rule in British India. Then the voting right was limited in the interest of the colonial rule. But people were rightly not happy with this. They demanded more and more exercise of their democratic power. And for this they had to finally earn their independence. But both in post-era Pakistan and Bangladesh the democratic, especially the voting rights could not be weapon of the people rather it was used for the vested interest groups in their name. So the study is hoped to show what shape will adult franchise take in future.*

## ভূমিকা

আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো নির্বাচন। নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ উপায় হিসেব গণ্য করা হয়. পদ্ধতিগত দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করা যায়।[১] হান্টিংটন বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের জীবনই কেবল নয় বরং তা স্বৈরতন্ত্রের মৃত্যুও।[২] রবার্ট ডাল মনে করেন, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণ কর্তৃক নেতাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় যা গণতন্ত্রের মূল প্রেরণা।[৩] গণতন্ত্রের প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে সরকারি ক্ষমতা লাভের জন্য এলিটদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং এ প্রক্রিয়ায় নির্ধারক হিসেবে কাজ করে জনগণের অংশগ্রহণ। আর নির্বাচন এ দু'টি উপাদানকেই কার্যকর করতে পারে। কেবল নির্বাচনই নয় বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং অর্থপূর্ণ নির্বাচনই গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে পারে।[৪] জনগণের ভোটাধিকার এবং ভোটদানের উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না। গণতন্ত্র জনগণের শাসন। জনগণের হয়ে তাদের প্রতিনিধিরা গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করেন। প্রতিনিধি নির্বাচনের উপায় হলো ভোটদান।[৫] বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। কারণ বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আকার, আয়তন ও

* সিনিয়র প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

জনসংখ্যার বিপুলতার জন্য প্রাচীনকালের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন এখন অচল। প্রাচীন গ্রীস বা এথেন্সে নগররাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ একত্রিত হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন বা রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। বর্তমানে তা অকল্পনীয়। এখন জনসাধারণ প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা পরোক্ষ পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে।[৬] জনসাধারণের এই অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই ঘটে থাকে।

একটি দেশের নারী পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটদানের এবং ভোটপ্রার্থী হওয়ার অবাধ অধিকারকে বলে সর্বজনীন ভোটাধিকার। আজকে যে সব দেশ গণতান্ত্রিক বা সুসভ্য বলে পরিগণিত সেখানেও মাত্র কিছুকাল পূর্বে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে বৃটেন ও আমেরিকার নারী, মজুর, একই পরিবারে বসবাসকারী অবিবাহিত ছেলে এবং কালোদের ভোটাধিকার ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কালোদের ভোটাধিকার ছিল না। শ্রীলংকায় বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর সেখানে তামিলরা প্রথম দিকে ভোটাধিকার পায়নি। বর্ণবৈষম্যের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রোডেশিয়ায় বৈষম্যমূলক ভোটাধিকার বজায় ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব দেশ বিভিন্ন দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দিকে তারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। যেমন, চিলি ১৯১৮ সালে স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। সেখানে ১৯৫২ সালে নারীরা এবং ১৯৭০ সালে নিরক্ষররা ভোটাধিকার পেয়েছিল। উরুগুয়ে অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে ১৯৩৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৭] বর্তমানে সকল দেশেই প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্যে পূর্বে বয়সকাল ছিল ২১ বছর কিন্তু বর্তমানে ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোট প্রদানের অধিকার লাভ করবে। এর জন্য কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন।

## বিভিন্ন সমাজে ভোটাধিকার

প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি বরং এটা রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফল। স্বৈরাচারের অবসান এবং গণতন্ত্রের বিকাশ লাভের মাধ্যমেই নির্বাচক ও নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাও বিভিন্ন বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমান স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়

বলে বলে মনে করা হয়। সে যুগে বিভিন্ন নামে এই ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট, ফ্রান্সের এস্টেট্‌স জেনারেল, স্পেনের করটেস (Cortes), জার্মানীতে ডায়েট (Diet) ইত্যাদিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনসভাগুলো গঠিত হয়নি। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) পর প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্ট প্রাধান্য লাভ করে। তার অব্যবহিত পরই প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে তা বলা যায় না। তবে উক্ত বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮২৮, ১৮৩২, ১৯৩২ সালের সংস্কার আইন বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

ঐতিহাসিক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা (universal and equal suffrage) বা 'এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক অর্থ'(one person, one vote, one value) বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফরাসী বিপ্লবের পর সাংবিধানিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভোটাধিকার গণতন্ত্রায়নের সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদীয়করণের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন দেশেই পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী এবং নিউজিল্যান্ড ১৮৮৯ সালের মধ্যেই পুরুষদের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করেছিল। তবে অষ্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বা পরে এই অধিকার প্রদান করেছিল। ১৯২০ সালের মধ্যেই পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশসমূহ সর্বজনীন ভোটাধিকারের বাস্তবায়ন করেছিল।[৯]

নারীদের ভোটাধিকার আরো পরে স্বীকৃতি লাভ করে। তবে নিউজিল্যান্ড ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে ১৮৯৩ সালেই নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।[১০] যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৮৬৯ সালে ওহাইউর ক্লিভল্যান্ডে মার্কিন মহিলা সমিতি গঠন করে। ১৮৯০ সালে এই সমিতি জাতীয় মহিলা ভোটাধিকার সমিতি নাম ধারণ করে এবং সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। সুজন এন্থনির নেতৃত্বে নারীরা জঙ্গি কৌশল অবলম্বন করে। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই ১১টি রাজ্যে মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯২০ সালের ২৮ আগস্ট মার্কিন শাসনতন্ত্রে ঊনবিংশতিতম সংশোধনীর ফলে মার্কিন মহিলারা এই অধিকার অর্জন করে। বৃটেনে ১৯০৩ সালে মিসেস প্যাঙ্ক হার্স্ট মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইউনিয়ন গঠন করেন যা ১৯০৬-১৯১৪ সালে জঙ্গিরূপ ধারণ করে। এর সদস্যরা কারাদণ্ড ভোগ করে এবং অনশনের আশ্রয় নেয়। ফলে ১৯১৮ সালে ৩০ বছরের অধিক বয়স্ক মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে। অবশ্য ১৯২৮ সালে তার নিচের, অর্থ্যাৎ ২১-৩০ বছর বয়স্করাও ঐ অধিকার পেয়ে যান।[১১] ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন এবং

সুইজারল্যান্ডকে (রোমান ক্যাথলিসিজম দ্বারা প্রভাবিত) নারীদের ভোটাধিকারের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[১২] জাপান ১৯৪৭ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে।

## ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে ভোটাধিকার

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করার পূর্বে এদেশে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারতে রাজাদের মনে করা হত ঈশ্বরের প্রতিনিধি।[১৩] রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল 'পরিষদ' নামে পরিচিত রাজার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই। তারা যথাসাধ্য নিজের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকার রক্ষা করে চলতেন এবং সীমাবদ্ধ করে রাখতেন রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা। এর পূর্ববর্তী আমলে বৈদিক যুগে সমাজের আরো ব্যাপকতর সম্প্রদায়ের লোকজন পরিষদের সদস্য হতে পারতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে এটি ছিল তখন আরও বেশি গণতান্ত্রিক এবং রাজা ও তার নীতিসমূহের উপর আরও স্পষ্টতর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। এই সময়ে ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে রাজা নির্বাচনের কয়েকটি সূত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে। অথর্ববেদে এই ধরনের একটি সূত্রের পংক্তি হল, 'বিশ নির্বাচিত তুমি শাসনের তরে'। এখানে এবং ঋগ্বেদেরও অনুরূপ শ্লোকে 'বিশ' শব্দে জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে। এই নির্বাচিত রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল নিজ প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।[১৪]

'সভা' নামের অপর একটি সংগঠনেরও বিবর্তন ঘটেছিল একইভাবে। গোড়ার দিকে 'সভা' ছিল অভিজাতদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এক ব্যাপক সমাবেশ যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্যাদি নিষ্পন্ন করত । কিন্তু মৌর্য যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে এই সভার সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল সমাজের মুষ্টিমেয় একটা অংশের মধ্যে এবং খোদ 'সভা' বিবর্তিত হয়ে পরিণত হল রাজকেন্দ্রিক এক পরিষদে বা রাজ সভায়।

অন্যত্র বলা হয়েছে, রাজা নির্বাচিত হতেন রেসিস (Rsis) এর মাধ্যমে। রেসিস বসত কিছু সদস্যের উপস্থিতিতে। এর সদস্য তারাই হতে পারত যারা রাজবংশীয় বা তার সমপর্যায়ের ছিল। এদেরকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হতে হত। বর্তমান যে প্রচলিত আইনসভা দেখা যায় এটা অনেকটা সেই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কোন বিষয় সে আমলে না থাকলেও পরোক্ষভাবে জনগণকে রক্ষা করার বিষয়টি সে আমলে প্রচলিত ছিল।[১৫] রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাজা দশরথ তাঁর ছেলে রামকে নির্বাচিত করে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করেছিলেন—যে শুধু শহরের ব্রাহ্মণদেরই রক্ষা করবে না বরং সমগ্র জনগণকে রক্ষা করবে। এ থেকেও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতার কথা খুঁজে পাওয়া যায়।[১৬]

ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল নামে একজন শাসককে পাওয়া যায় যিনি ভোটের মাধ্যমে বাংলার রাজা হয়েছিলেন। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থা তখন বিদ্যমান ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে পাল রাজবংশ নামে রাজত্ব করেছিলেন।[১৭] পরবর্তীতে মোঘলরা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। সেখানে বর্তমান ভোটাধিকারের ব্যবস্থার কোন প্রচলন ছিল না। বর্তমান রাজাই পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে মনোনয়ন দিতেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ড দীর্ঘদিন যাবৎ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারলেও বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটাতে পারেনি বরং রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ছিল তৎকালীন রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

## ব্রিটিশ-ভারতে ভোটাধিকার

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পরাজিত হন। ভারতবর্ষে শুরু হয় কোম্পানী শাসন। প্রথম দিকে কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করা। ধীরে ধীরে তারা এদেশের শাসন ব্যবস্থার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। শাসন ব্যবস্থায় মূল পদগুলোতে কোম্পানীর লোকদের নিয়োগ দেয়া হত। নিম্ন পদগুলো পূরণ করা হত ভারতীয়দের দ্বারা। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত আকারে ছিল এবং এরা কোম্পানীর অনুগত ছিল। ধীরে ধীরে কোম্পানীর ভারতীয়দের প্রতি শোষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। এভাবে তাদের প্রতিবাদ করবার মানসিকতা গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম বড় আকারের প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দেয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে বিদেশী ইংরেজ শাসকরা বড় রকমের ধাক্কা পায়। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে দায়িত্ব নেয় ব্রিটিশ সরকার। সে সময় ব্রিটিশ সরকার অনুভব করতে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই তারা বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। এর ফলে ভারতবর্ষে নির্বাচন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৭০ সালের বাংলার গ্রাম চৌকিদারী আইন অনুযায়ী গ্রাম 'পঞ্চায়েত'-এ ৫ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হত যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করত। অবশ্য এই সদস্যদের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মনোনয়ন দিতেন। স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে একটি প্রস্তাব পাশ করেন। এটি সংশোধিতরূপে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন নামে ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলে পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৫ বর্গমাইল এলাকার জন্য ৫ থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য প্রথম বারের মত গ্রামীণ পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

১৯০৯ সালের আইন (মর্লি-মিন্টো সংস্কার) নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর একটি নির্বাচনী এলাকায় ভোটদাতার সংখ্যা ৯/১০ জনের বেশি ছিল না। ভোটার সংখ্যা কম থাকায় সমুদয় ভোট নিতে অসুবিধা হয়নি। এ আইনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ। জনসাধারণ স্থানীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। পরে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো নির্বাচকমণ্ডলী। নির্বাচকমণ্ডলী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচন করতেন ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্যদের। এর ফলে আইন পরিষদে আসীন সদস্যদের সঙ্গে জনগণের কোন সংশ্রব থাকতো না।

১৯১৯ সালের আইনে পরোক্ষ ভোটদানের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ভোটারদের যোগ্যতা প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তবে মোটামুটিভাবে যারা বছরে ১৫ থেকে ২০ টাকা পৌর কর দিতেন বা বার্ষিক ১৮০ টাকা ভাড়া হতে পারে এরূপ গৃহের যারা মালিক অথবা যারা বছরে ২০০০ টাকা অথবা ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়কর দিয়ে থাকেন অথবা যারা বছরে ৫০ হতে ১৫০ টাকা ভূমি রাজস্ব প্রদান করতেন তারাই এ পরিষদে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতেন। যাদের বার্ষিক আয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা অথবা যারা বছরে ৭৫০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব প্রদান করতো বা জনকার্যে যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে বা যাদেরকে বিদ্বান বা পণ্ডিত হিসাবে স্বীকার করা হয় তাদের রাজ্য পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। কাজেই, লক্ষ্য করা যায় ১৯১৯ সালের আইন জনগণ ভোটাধিকার লাভ করলেও তা শর্তযুক্ত ছিল এবং সর্বজনীন ছিল না। অবশ্য এ আইনে নারীদেরকে ভোটাধিকার দেয়া হলেও তা খুবই সীমিত পর্যায়ে ছিল।

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেল ও দুই-কক্ষ আইন পরিষদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা গঠন করা হয়। উচ্চ পরিষদের ২৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫০ জন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন হয়। আইন সভার নিম্ন পরিষদে ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৫০ জন প্রাদেশিক আইন পরিষদ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। এ আইনে দেখা যায়, সে সময় সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। এ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। তন্মধ্যে ২ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ, ৬০ লক্ষ

নারী। প্রায় ১০% হরিজন ভোটাধিকার লাভ করেছিল। নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম লেখাবার জন্য কয়েকটি যোগ্যতার প্রয়োজন হতো। সর্বনিম্ন বয়স ২১ বৎসর হতে হত। কোন বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি সর্বজনীন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হতে পারতেন না। এছাড়া তাকে আয়কর কিংবা ভূমি রাজস্ব কিংবা কৃষি জমির ব্যাপারে ভাড়া কিংবা শহরে ঘর ভাড়া কিংবা ন্যূনতম কিছু কর প্রদান করতে হত। নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন-ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা সেনাবাহিনীর বরখাস্ত পেনশনভোগী বা অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বা অফিসার হয়ে থাকলে যে কোন ব্যক্তি ভোটার হবার যোগ্য ছিলেন। ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচন এ দেশে নির্বাচনী রাজনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সেগুলো সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।[১৮]

## পাকিস্তান আমলে ভোটাধিকার

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান তখন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান নামে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর কোনো সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় কিন্তু এটি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন এলিটরা কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেনি। একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এ অবস্থাকে বলেছেন 'নির্বাচনবিহীন গণতন্ত্র'।[১৯] সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ। ভোটাররা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরোধীতা করে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রতি সমর্থন প্রদান করে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৬৫% ভাগ।[২০] নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ৩০৯টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে, যুক্তফ্রন্ট ২৯৯টি আসন লাভ করে। কিন্তু ভোটারদের এই দাবী বা মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। ১৯৫০ এর দশকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে জনগণের ভোটাধিকার তথা গণতন্ত্র কেবলই যে কাগজে কলমে ছিল তার প্রমাণ মেলে একজন বিশ্লেষকের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, "There was seven Prime Ministers in Pakistan during the era of parliamentary democracy (1947-1958). With the exception of the first Prime Minister, none of the remaining six Prime Ministers were elected as a result of the vote of confidence in the legislature. They are the products of 'Palace intrigues' by the two Governor Generals, Gulam Mohammad and

Iskander Mirza. There was a cabinet, there was a Parliament but the real powers were excercised by the Governor General with the help of ruling elite, composed of the top civil and military officials."[২১]

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। আইয়ুব ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ (Basic Democracy Order) অনুসারে মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। এতে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হতে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হত। এরাই আইন সভার সদস্য ও রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করতে পারত। ১৯৬১ সালের জরিপ অনুসারে, পূর্ব পাকিস্তানে ০.০৮% ও পশ্চিম পাকিস্তানে ০৯% জনগণের ভোটাধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচিত করা হয়েছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত Combined Opposition Party (COP) এর প্রার্থী ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ। নির্বাচনে আইয়ুব খান ৬৩.১% ও ফাতেমা জিন্নাহ ৪৬.৬% ভোট পান। এতে ভোট প্রদান করেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা। কিন্তু যদি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত সেক্ষেত্রে ফলাফল হয়ত অন্যরকম হতে পারত। কারণ মোট ভোটারের সংখ্যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভোটার বেশি ছিল। কাজেই এই পরোক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভোটারদের মতামত বা অধিকারকেই কার্যত হরণ করা হয়েছিল। একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। এই ৬ দফা দাবী আদায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের মার্চে ক্ষমতায় এসে বলেন, "It is my firm belief that sound, clean and honest administration is a prerequisite for sane and constructive political life and the people elected freely and impartially on the basis of adult franchise." [২২]

ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুসারে, ১৯৭০ সালের অক্টোবরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক যাতে ব্যাপক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশ নিয়েছিল এবং ৬০%ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছিল।[২৩] দুটোতেই আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য

নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে ৭টি মহিলা আসন ছিল। প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকরা তাদের পূর্বের নীতি অনুসারে, জনগণের ভোটের অধিকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে এবং নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান আমলে জনগণের ভোটের অধিকার দেয়া হলেও সাধারণ জনগুণের মতামতকে তারা বরাবরই মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এ সময়ে, জনগণের ভোটের অধিকার শুধুমাত্র কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে জনগণের ভোটাধিকার অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য হয়েছিল।

## স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে ভোটাধিকার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মোট ৮টি সংসদ নির্বাচন, ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৩টি গণভোট এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনই ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। উন্নত নির্বাচন ব্যবস্থার মাপকাঠি হচ্ছে, সর্বজনীন ভোটাধিকার, সকলের ভোটের মূল্য সমান, গোপন ব্যালট এবং প্রত্যক্ষ ভোট ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয়েছে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা বা সমুন্নত করার জন্য নয়। নির্বাচনে শাসক দল চেয়েছে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতার ভিত্তি সুসংহত করা, দলীয় ও অনুগত অনুসারী তৈরীর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। নির্বাচনে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কারচুপি ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জনগণের মতামতের প্রতিফলন কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কাজেই ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনের উপর জনগণের পূর্ণ আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়েছে।[২৪]

১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।[২৫] সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> " সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না ।"

১২২ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

" প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।"

১২২ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) তাহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকায় অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন ।[২৬]

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছে মোট পাঁচটি । এর মধ্যে ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হয় । ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় পরোক্ষভাবে সংসদ সদস্যের ভোটে । ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণ কোন প্রকার বাধা ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছিল । সামরিক আইনের আওতায় ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই নির্বাচনকে বিরোধী দল 'প্রহসন' বলে চিহ্নিত করে । ১৯৮৬ সালের নির্বাচনেও সব বিরোধী দল অংশ নেয়নি । এ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগে কোন আগ্রহ ছিল না । তাই এ দুটো নির্বাচন কোন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি ।[২৭]

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত তিনটি গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে । ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালের গণভোটের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শাসকদের ক্ষমতার বৈধতা দেয়া । এই গণভোটে কোন বিকল্প না থাকায় জনগণের মধ্যে এই নির্বাচনগুলো সম্পর্কে কোনো আগ্রহ ছিল না । মূলত দলীয় লোকদের দ্বারা সমর্থন সংগ্রহ করা হয়েছিল । ১৯৯১ সালের গণভোটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছিল । এই গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে আসা হয় । পরবর্তী সারণিতে এ সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হলো:

## বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণভোট

| গণভোট | তারিখ | মোট ভোটার | ভোট প্রদান | মোট ভোটারের শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৩০.০৫.১৯৭৭ | ৩৮৩৬৩৮৫৮ | ৩,৩৭,৭৯,৭৫৮ | ৮৮.০৫ |
| ২য় | ২১.০৩.১৯৮৫ | ৪৭৯১০৯৬৪ | ৩,৪৫,৭২,৫১৪ | ৭২.১৫ |
| ৩য় | ১৫.০৯.১৯৯১ | ৬১৯৬৩১০৮ | ২,১৮,৮৮,৪৩৭ | ৩৫.১৯ |

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আটটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নের সারণিতে নির্বাচনের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হলো:

## বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন

| সংসদ নির্বাচন | তারিখ | মোট ভোটার | মোট দেয় ভোট | শতকরা হার | মোট বৈধ ভোট | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ০৭.০৩.১৯৭৩ | ৩,৫২,০৫,৬৪২ | ১,৯৩,২৯,৬৮৩ | ৫৪.৯০ | ১,৮৮,৫১,৮০৮ | ৫৩.৫৪ |
| ২য় | ১৮.০২.১৯৭৯ | ৩,৮৭,৮৯,২৩৯ | ১,৯৬,৭৬,১২৪ | ৫০.৯৪ | ১,৯২,৬৮,৪৩৭ | ৪৯.৬৭ |
| ৩য় | ০৭.০৫.১৯৮৬ | ৪,৭৮,৭৬,৯৭৯ | ২,৮৯,০৩,৮৮৯ | ৬০.৩১ | ২,৮৫,২৬,৬৫০ | ৫৯.৫৮ |
| ৪র্থ | ০৩.০৩.১৯৮৮ | ৪,৯৮,৬৩,৮২৯ | ২,৮৮,৭৩৫৪০ | ৫৭.৯০ | ২,৮৫,২৬,৬৫০ | ৫৭.২০ |
| ৫ম | ২৭.০২.১৯৯১ | ৬,২০,৮১,৭৯৩ | ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ | ৫৫.৪৫ | ৩,৪১,০৩,৭৭৭ | ৫৪.৯৩ |
| ৬ষ্ঠ | ১৫.০২.১৯৯৬ | ৫,৬১,৪৯,১৮২ | ১,১৭,৭৬,৪৮১ | ২৬.৭৪ | - | - |
| ৭ম | ১২.০৬.১৯৯৬ | ৫,৬৭,০২,৪২২ | ৪,২৮,৮০,৫৬৪ | ৭৫.৬০ | ৪,২৪,১৮,২৭৪ | ৭৪.৮১ |
| ৮ম | ০১.১০.২০০১ | ৭,৪৯,৪৬,৩৬৪ | ৫,৬১,৮৫,৭০৭ | ৭৫.৫৯ | ৫,৫৭,৩৬,৬২৫ | ৭৪.৩৭ |

বাংলাদেশের এক দলীয় এবং সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারি) সালের নির্বাচনসমূহে ভোটারদের আগ্রহের অভাব ছিল ও ভোট প্রদানের শতকরা হারও কম ছিল। ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এই নির্বাচনগুলোতে ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই মাস্তানদের দ্বারা ভোট প্রদান করা হয়েছিল। ফলে নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য হয়নি। বাস্তবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়নি। একইভাবে ১৯৮৬ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে দেশের উল্লেখযোগ্য কোন বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি। জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথমে নির্দলীয় অন্তবর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে ১৯৯১ এবং পরবর্তীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের

মাধ্যমে এই নির্বাচনগুলো দেশে এবং বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। নির্বাচনগুলো জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ভোটারদের অংশগ্রহণের শতকরা হারও অধিক ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারী ৯ম সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধীতা ও পরবর্তীতে সহিংসতা শুরুর পেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর সমর্থনে বর্তমানে ফখরুদ্দিন আহমেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। নির্বাচন কমিশনও ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি গণতন্ত্র চর্চার অভাব ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতির কারণেই নির্বাচিত সরকারের স্থলে একটি অনির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণ এখন সঠিক যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে এবং আশা করছে অচিরেই কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এদেশে গড়ে উঠবে।

স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলোতে জনগণ ব্যাপক মাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ছোটখাট কারচুপি ব্যতীত বড় ধরনের কোন গোলযোগ বা সহিংসতা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে জনগণ সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে, প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে এবং নিজেরাও প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ১৯৯৮ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের সাফল্য বলা যায়। মহিলারা এত দিন শুধুমাত্র ভোট প্রদান করেছে বা তাদের জন্য মনোনীত আসন সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের যে ভোট পাওয়ার অধিকার রয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। তবে বাস্তবে এতে নারীর ক্ষমতায়ন কতটা হয়েছে সেটা গভীর পর্যালোচনার বিষয় বটে।

## নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও ভোটাধিকার

বাংলাদেশে নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জনগণের ভোটাধিকারকে সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য অনেক দেশের মত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এটি নির্বাচন সুষ্ঠকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে এবং জনগণ, সরকার ও সর্বোপরি সরকার পর্যবেক্ষকদের ভূমিকাকে গ্রহণ করেছে ও স্বাগত জানিয়েছে। নব্বই এর দশকের পর এদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিধি বিস্তৃত হয়। বিচারপতি

সাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এ দেশে এসেছিল আমেরিকান, ব্রিটিশ,জাপানী ও মালয়েশিয়া, ইউরোপীয়ান কমিউনিটি ও সার্ক দেশগুলো থেকে প্রেরিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল। এছাড়া, স্বদেশী নির্বাচক পর্যবেক্ষণকারী দল হিসেবে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ও লিবার্টি ফোরাম এ নির্বাচনটি পর্যবেক্ষণ করে। মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই), কমনওয়েলথ, সার্ক, জাপান, কানাডা, কম্বোডিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানী, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, ইতালী, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইডেন থেকে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল এসেছিল। দেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় সংস্থা, সেড, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) প্রভৃতি। ঠিক একইভাবে ২০০১ সালের লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একাধিক দেশী ও বিদেশী নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল : নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দশটি বড় এনজিও মিলে গভর্নেন্স কোয়ালিশন গঠন করে। এ দশটি এনজিও হচ্ছে ফেমা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ডেমোক্র্যাসী ওয়াচ, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং আরো কয়েকটি এনজিও।

২০০৮ সালের নির্বাচনে একই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ভোটাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারছে সেটা নিয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তারা মনে করেন, শুধুমাত্র নির্বাচনের দিনের পর্যবেক্ষণ দিয়ে নির্বাচনী দুর্নীতি, কারচুপি ও অনিয়মের সকল রহস্য উদঘাটন করা যায় না। বরং মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই পর্যবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত করে দিতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু একথা সত্যি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কারচুপি, অনিয়ম রোধ অনেকাংশে হ্রাস করে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে।[২৮]

## উপসংহার

বাংলাদেশে ভোটাধিকার এবং এ বিষয়ে জনগণের সচেতনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক উন্নত দেশের তুলনায় এ দেশের মানুষ অনেক বিলম্বে সর্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করেছে। উপরন্তু, এ দেশের গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ নির্বাচনী রাজনীতির অনুশীলন শুরু হলেও তা অদ্যবধি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সবসময়ই জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, অগণতান্ত্রিক শক্তি বিভিন্নভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভোট কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল, নির্বাচনে মাস্তানদের দৌরাত্ম্য, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি ইত্যাদির কারণে জনগণ বহুলাংশে ভোটাধিকার হারিয়েছিল। এক্ষেত্রে জনগণের অসচেতনতা, নির্লিপ্ততা তাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করেছে। জনগণের ভোটের অধিকারের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী ও সময়ের দাবি।

**তথ্যসূত্র**

১. Schumpeter Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Union Paperbacks, 1987, P.269

২. Huntington Samuel P, *The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991, P. 174

৩. Dahl Robert, *A Preface to Democratic Theory*, University of Chicago Press, 1956, P.3

৪. মান্নান মোঃ আব্দুল, বাংলাদেশে গণতন্ত্র সমস্যা ও সম্ভাবনা, আফসার ব্রাদার্স, ২০০২, পৃষ্ঠা-২১

৫. ফিরোজ জালাল, *পার্লামেন্টারী শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২১১

৬. মোঃ মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী বিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৪১০

৭. Seymour Martin Lipset, *The Encylopedia of Democracy*, Vol-4, Routledge, London, Page- 1355

৮. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১০-৪১১

৯. Seymour Martin Lipset, Ibid, Page- 1356

১০. Seymour Martin Lipset, Ibid, Page- 1356

১১. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতি কোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৫৪

১২. Seymour Martin Lipset, Ibid, Page- 1354

১৩. H.S. Bhatia (ed.), *Origin and Development of Legal and Political System in India*, Vol-1, Deep and Deep Publication, 1976, P-49

১৪. কো আন্তনভা, গ্রি বোন্‌গার্দ লেভিন, গ্রি কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭

১৫. John W. Spellman Calarendon, *Political Theory of Ancient India*, Oxford University Press, 1964, P-16

১৬. H.S. Bhatia (ed.),Ibid, P-50

১৭. A.Z.M. Shamsul Alam, *Democracy and Election*, Bangladesh Cooperative Book Society Ltd. Dhaka, September 1996, P-91

১৮. মান্নান মোঃ আব্দুল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২

১৯. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, Oxford University Press, 1973, Bangladesh.

২০. Maniruzzaman Talukder, *The Politics of Development: The Case of Pakistan (1947-58)*, Green Book House Limited, Dhaka, 1971, P.131

২১. G.W. Chowdhury, *Pakistan: Transition from Military to Civilian Rule*, Scorpion Publishing Ltd. 1988, P- 19

২২. G.W.Chowdhury, *The Last Days of United Pakistan*, C. Hurst and Company, London, 1974, P-48

২৩. G.W.Chowdhury, opcit, P-129

২৪. মান্নান মোঃ আব্দুল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬-২৮

২৫. গাজী শামছুর রহমান, *প্রশাসনিক আইনের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৪১৮

২৬. আরেফিন এ এসএম সামছুল (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, বাংলাদেশের রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৭-৫৩

২৭. A.Z.M. Shamsul Alam, Ibid, P-84-87

২৮. আখতার মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, *দুর্নীতি, নির্বাচন ও রাজনীতি স্বরূপ বিশ্লেষণ সংকট উত্তরণ*, পরমা , ২০০৩ পৃষ্ঠা-৪২-৫৬

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের ভূমিকাঃ একটি পর্যালোচনা

*মোহাম্মদ আবু মুসা* *

***Abstract:*** *The role of the women in our glorious Independence War of 1971 was significant. Beside men, women also played an important role as organizer, commander and guerrilla leaders. Almost 400 women Freedom fighters trained in the war training camp operated by the Government in Exile, Calcutta, India. But the glorious role as well as the sacrifices and sufferings of our mother and sisters have always been uncovered in the history of the Independence War. In such a situation an attempt is taken to reconstruct the history of women's role in the War of Independence, which is an indispensable part of our history of Liberation war, great victory as well as nation-building process.*

## ভূমিকা

"কত নর দিল কত খুন রণে—লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে"

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় নারীর গৌরবোজ্জল ভূমিকা খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি বরং কবিতার উপর্যুক্ত দুটি চরণই যেন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, গেরিলা-নেত্রী ও সহযোদ্ধা। মা সন্তানকে, বোন ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। আহতদের সেবা করেছেন, মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, ধর্ষিত হয়েছেন, গোপনে অস্ত্র বহন করেছেন, গেরিলা ট্রেনিংসহ অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেছেন। নারীরা সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছেন। যুদ্ধে আহত হয়েছেন এবং অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা সাহস, কৃতিত্ব ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বাঙালির অব্যাহত মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের রূদ্ধ সমাজে একজন পুরুষ যেভাবে স্বেচ্ছায় যে কোন কর্মে নিয়োজিত হতে পারে, সেভাবে একজন নারীর পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিবার এবং সামাজের দেয়াল ভাঙাসহ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে এগুতে হয়। কারণ, আমাদের সমাজ এখনো

* এম. ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

নারীর ব্যাপারে তেমন উদারতার পরিচয় দিতে শিখেনি। কিন্তু তবুও নারী থেমে যায় নি, নিজ যোগ্যতা ও সাহসিকতার সাথে দ্রোহের পরিচয় তুলে ধরেছেন কালে কালে। এভাবেই আবাহমান কাল ধরে বাংলায় যে সমস্ত আন্দোলন, প্রতিবাদ-সংগ্রাম জন্ম নিয়েছে, তাতে নারীও অংশ নিয়েছেন পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে (হোসেন,১৯৯৯: ২৭) । বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যেমন নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রমাণ মেলে, তেমনি পাকিস্তান -এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তথা স্বাধীনতা যুদ্ধেও তাদের দুর্বার উপস্থিতি লক্ষণীয়।

ব্রিটিশ আমলে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত দীপ্তিময়। পাকিস্তান আমলে এসে তা আরো ব্যাপক হয়। পাকিস্তান আমলের শুরুতে তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য ও নেতৃত্ব নারীর এবং তা নারীরই বিজয়গাথা। এরপর আসে ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। এখানেও নারীদের অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়। কারণ, ভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রে ছাত্ররা যে সিদ্ধান্ত নেয়, এর প্রথম দলগুলোতে ছিলেন ছাত্রীরা। এরপর ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মহিলাগণ ব্যাপকভাবে প্রচারণায় অংশ নেন। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে ১৪ জন নারী প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। এছাড়া পরবর্তী ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালের প্রতিটি আন্দোলনে নারীর সাহসিকতা আন্দোলনকে বেগবান করেছে (বেগম, ১৯৯৫: ৬১)। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল আরো উজ্জ্বল, নির্ভীক ও দুঃসাহসী।

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি নয়। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের পেছনে অশুভ ইঙ্গিত বাংলার মানুষ বুঝতে পারে (Hassan,1994: 56)। তখন থেকেই বাংলার নারী-পুরুষ নিজেদের নিরাপত্তা ও জাতিগত স্বার্থে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বাঙালি নারী-পুরুষ প্রাথমিক প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন ।

৭ই মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর কর্মীরা ৭ই মার্চ সকাল ৮টায় প্রথম কুচকাওয়াজ এর মধ্য দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীকর্মীরাও কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। ৭ই মার্চের এই সামরিক প্রশিক্ষণের সংবাদ খবরের কাগজে বের হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে সংগ্রামের শিহরণ জেগে ওঠে। এ দিন পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী ৮ মার্চ থেকে পূর্ববাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র কার্যত অচল হয়ে পড়ে (রহমান, ১৯৮৩: ৭৪০-৭৪৬)।

২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক রাতের অন্ধকারে আকস্মিক আক্রমণে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার প্রেক্ষিতে প্রতিরোধ আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে কয়েকমাস অসংগঠিত বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সচেতন নেতৃবৃন্দ, সেনাবাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনাসদস্য-অফিসার, আনসার, ইপিআর, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাই প্রাথমিক প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সর্বস্তরের জনগণ বুঝতে পারে যে, অস্ত্রের ভাষাতেই এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের জবাব দিতে হবে (Shafiullah,1989: 85) । তাই তাদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন থানায় পুলিশের কাছ থেকে নেওয়া থ্রি নট থ্রি (৩০৩) রাইফেল এবং অনেকের ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতির মাধ্যমে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধে রূপ নেয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যার যা ছিল তা নিয়ে মানসিকভাবে প্রাথমিক প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন।

## প্রবাসী সরকারে নারী

পূর্ব-পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫ মার্চের কালো রাত্রির হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থান পরিবর্তন হয় এবং জাতির এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রণকৌশল নির্ধারণের জন্য একত্রিত হতে চেষ্টা করেন। ফলে ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় পূর্বপাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় (Islam,1981:75)। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় সকাল ১১ টায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। এই স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং প্রবাসী সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই অনুষ্ঠানে সারা দেশের নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন বেগম নাজিয়া ইসলাম।

নবগঠিত এই অস্থায়ী মন্ত্রীসভা সরকারের বেসামরিক প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যে সমস্ত সংসদ সদস্য, সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ পেশাজীবী দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন।

এই সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (ভারতের শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র) থেকে বাংলাদেশ সরকারে যোগদানের আহ্বান-সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতে থাকে, এই

আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড ও প্রবাস থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পেশাজীবীগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে অধিকতর সংখ্যায় যোগদান করতে থাকেন। ফলে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো একটি দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। এই প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার শাখাগুলোতে যেসব নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- অর্থ মন্ত্রণালয়ে মধুরানী সাহা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডা. তাহেরা খাতুন, আক্তার জাবিন হোসেন, প্রমুখ।

যুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী সরকারের অধীন বিভিন্ন যুব-শিবিরগুলোতে রাজনৈতিক সমন্বয়কারী, কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতী সন্তান বেগম নূরজাহান মোর্শেদ ও মমতাজ বেগম। অন্যান্য এলাকায় ছিলেন বেগম রাফিয়া আক্তার ডলি, বেগম সাজেদা চৌধুরী ও বেগম বদরুন্নেছা প্রমুখ।

প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতার নিমিত্তে ১০ই জুলাই আগরতালায় ১০ সদস্য-বিশিষ্ট আওয়ামী মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মিসেস জাহানারা, সহ-সভাপতি মিসেস আম্বিয়া আজম, সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস ফরিদা মহিউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদিকা ফোরকানা বেগম, কোষাধ্যক্ষ রিজিয়া চৌধুরী এবং নির্বাহী সদস্য ছিলেন মিসেস নূরজাহান জহুর, মিসেস সূচিত্রা গাঙ্গুলী, মিনারা বেগম (ঝুনু), মিস্ সাজেদা চৌধুরী, মিসেস ফিরোজা আতিক। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল নার্সিং প্রশিক্ষণ, গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ, হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ, রিলিফ ওয়ার্ক এবং মাতৃ ও শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা (বেগম, ১৯৯৮: ৮১)।

**অস্ত্রহাতে প্রশিক্ষণ**

নারী সমাজের অদম্য প্রাণশক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করার জন্য তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্টপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, ত্রাণমন্ত্রী কামরুজ্জামান হেনা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধা নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ-ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অবস্থান ছিল কলকাতার পদ্মপুকুর ও পার্ক সার্কাস-এর মধ্যবর্তী গোবরা এলাকায়। এটাই মুজিবনগর সরকার অনুমোদিত একমাত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ-ক্যাম্প, যা ‘গোবরা ক্যাম্প’ হিসেবে পরিচিত (রহমান, ২০০৩: ২৭৭)। এই ক্যাম্পে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন চলে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। এখানে প্রায় ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে নারী মুক্তিযোদ্ধারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আবার কেউ সেবার কাজে

নিয়োজিত হন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, কেউ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে অত্যন্ত সাহসী ছাত্রলীগের কিশোরী নেত্রীদেরকে গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডের আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পের পলিটিক্যাল মটিভেটর ছিলেন জনাব আমিনুল হক আর প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের মেজর কে. বি. সিং ও মেজর আর. সি. শর্মাসহ আরো কয়েকজন। 'মহিলা গেরিলা স্কোয়াড' ট্রেনিংয়ে প্রথম ৮ জন মহিলা অংশগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার শাহপুর গ্রামের মমতাজ বেগম ও বাঞ্ছারামপুর থানার মধ্যনগর গ্রামের আমেনা সুলতানা বকুল অন্যতম (বেগম, ১৯৯৮: ১৪৭)। এছাড়াও অন্যরা হলেন—মিনারা বেগম ঝুনু, ফরিদা খানম সাকী, শামসুন্নাহার ইকু, আলেয়া বেগম, স্বপ্না চৌধুরী। পরবর্তীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন—বরিশালের করুনা বেগম, শোভারানী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, শোভা, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, মেহেরুন নেছা, পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম, যশোরের সালেহা বেগম, সুনামগঞ্জের পেয়ার চাঁদ, কুড়িগ্রামের তারামন বিবি, প্রমুখ।

### প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নারীর ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল নারীরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খালেদা খানম, তারামন বিবি, রিজিয়া চৌধুরী, মমতাজ বেগম প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খালেদা খানম। তিনি মাদারীপুর ও শরিয়তপুর এলাকায় কাজ করেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিলো স্থানীয় কয়েকজন নেতার সাথে পালং থানা আক্রমণ। এই অপারেশনে তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন স্টুয়ার্ড মুজিব, হাফিজুর রহমান, নাসির উদ্দিন, ফজলু মাস্টার প্রমুখ। এছাড়া তিনি যুদ্ধকালীন সময় স্থানীয় সিনেমা হলে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ করেছিলেন। অবরুদ্ধ শরিয়তপুর ও মাদারীপুরের সবখানে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান ছিলো শক্তিশালী, এমন একটি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ অসম্ভব ব্যাপার ছিলো।

এছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধে আরও যে সকল নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিথিকা ও শিশির; তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো স্বরূপকাঠিতে পাকিস্তানী বাহিনীর লঞ্চে আক্রমণ। ১৯৭১ সালে ১১ই জুলাই

রাতে স্বরূপকাঠি লঞ্চঘাটে পাকিস্তানিদের তিনটি লঞ্চ ভিড়ানো ছিলো। মুক্তিবাহিনী এই লঞ্চ তিনটি ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বিথিকা ও শিশিরকণা নৌকা থেকে নেমে সাঁতার কেটে কচুরিপনার সাথে মিশে লঞ্চের কাছে গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানি বাহিনীর লঞ্চ (নাসরীন, : ২৩)। সাথে সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর মেশিন গানও গর্জে উঠে। এই দুই দুঃসাহসী নারী অপারেশনের পর রাতের অন্ধকারে কচুরিপানার আড়ালে অনেকক্ষণ ভেসে থাকার পর তীরে ফিরে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালিদের পাশাপাশি আদিবাসী নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাখাইন বীরাঙ্গনা প্রিনছা। পালকপিতার ঘরে বড় হয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাঁর পিতাকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন। একদিন পাকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। সেখানে অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন সয়ে তিনি হানাদার পাকবাহিনীর রান্নার কাজ করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি পাকবাহিনীর নিকট বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। কাম্পে জালানী কাঠ সরবরাহকারী বাবুলের সাথে পরিকল্পনা করে চিকিৎসার নাম করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বিষ সংগ্রহ করেন (হোসেন, ১৯৯৯: ২২৫)। এক রাতে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে ক্যাম্পের সবাইকে খাইয়ে বাবুলের সাথে পালিয়ে যান। পরে জানা যায় ৪২ জন শত্রুর মধ্যে ১৪ জন মারা যায়।

মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। তারামন বিবি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম। কিন্তু যুদ্ধ শেষে খেতাবপ্রাপ্তির পরও তিনি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। গতানুগতিক ধারার জীবনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ২৪ বছর পর ১৯৯৫ সালে ময়মনসিংহের অধ্যাপক বিমল কান্তি দে-র ব্যাক্তিগত অনুসন্ধিৎসু উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে তারামন বিবি নতুনভাবে আবিস্কৃত হন। পরবর্তীকালে নারী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ তাঁকে ঢাকায় এনে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন।

কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর থানার শঙ্করমাধবপুর গ্রামে তারাভানু ওরফে তারামন বিবি জন্মগ্রহণ করেন। হাবিলদার মুহিব তারাভানুকে রান্নার কাজে নিয়োগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুহিব হাবিলদার তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন তারামন (Biswas, 2007:90)। দিনরাত যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা দেখে তারামনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা জাগে। একদিন অস্ত্রচালনা শিক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাবিলদার মুহিবও তারামনকে ধীরে

ধীরে অস্ত্রচালনায় শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। এভাবে তারামন থ্রি নট থ্রি, এস. এম. জি., এস. এল. আর-সহ বিভিন্ন অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারামন বিবি কয়েকটি যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই আগস্ট চর নেওয়াজী স্কুলের নিকট পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি যুদ্ধে তিনি সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। বিকাল তিনটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। তারামন বিবি কর্তৃক যুদ্ধে ব্যাপক অবদান এবং সরকার কর্তৃক তাঁকে বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়ার পরও তাঁর পরিচিতি জানতে আমাদের এতটা দিন পার করতে হয়েছে।

## মুক্তিযুদ্ধে আশ্রয়দাত্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণকারী রূপে নারীরা

মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সারা দেশে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিলেন। এজন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল নিরাপদ আশ্রয়। বাংলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রাম বা শহরের গৃহবধূরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দিতেন। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁরা অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজের শোবার ঘরে, বাথরুমে, বা গোসলখানায় লুকিয়ে রেখে পাকসেনা, রাজাকার, আলবদরদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। কখনও কখনও মুক্তিযোদ্ধাকে স্বামী বা নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। আশ্রয়প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার সরবরাহ করতেন। অনেক সময় নিজেরা অভুক্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্ন জুগিয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা এলাকায় সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তেমনি এক নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। কসবা থানা সদর থেকে ১০ কি.মি. দূরে মঈনপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি, নাম রহিমা খাতুন। রহিমাদের বাড়িটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। তাঁদের রান্নাবান্না করে দিতেন রহিমা খাতুন নিজেই এবং তাঁকে সহায়তা করতেন দুই প্রতিবেশী আছিয়া খাতুন ও সাহেরা খাতুন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হানাদার পাকিস্তানিদের আক্রমণ থেকে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে রক্ষা করেন। যুদ্ধক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঘুমাতেন, রহিমা খাতুন রাত জেগে জেগে তাঁদের পাহারা দিতেন (হোসেন, ১৯৯৯: ৩২৪)। একবার রাজাকার এবং পাকবাহিনীর আক্রমণের প্রস্তুতি টের পেয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জাগিয়ে তোলেন। মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী ও রাজাকাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

অস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্বও মহিলারা পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে যাওয়া

অস্ত্রশস্ত্র চালের পাত্রে, মুরগির খোঁয়াড়ে, বিছানার নিচে, মাটির নিচে, বাথরুমে, আলমারিতে লুকিয়ে রাখতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতেন।

## সেবা-প্রদানে নারী

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজনে 'বাংলাদেশ ফোর্সেস হাসপাতাল' নামে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এই হাসপাতালটির অবস্থান ছিল ২ নং সেক্টরে। ১০ই মে ১৯৭১ আগরতলাস্থ সোনামুড়া বন বিভাগের বিশ্রামাগারে ক্যাপ্টেন আখতার আহমদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিকভাবে এই হাসপাতাল স্থাপন করা হয় (বেগম, ১৯৯৮: ২২৮)। ভারতীয় বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আগস্ট মাসে খালেদ মোশাররফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার এই হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন এবং প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুরিসহ ৪ জন প্রকৌশলীকে এই হাসপাতাল পুনর্গঠনের জন্য প্রেরণ করেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ২৬শে আগস্ট ১৯৭১ আগরতলার সন্নিকটে শ্রী হাবুল ব্যানার্জীর বাগানে এই হাসপাতাল পুনরায় স্থানান্তরিত হয় এবং বাঁশ ও চাটাই দিয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এই হাসপাতালে ২০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময়ে লন্ডনে প্রশিক্ষণরত ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, ডা. মবিন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নরত বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এই হাসপাতালে যোগদান করায় হাসপাতালের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মহিলা ডাক্তার ছিলেন ক্যাপ্টেন সেতারা । এই হাসপাতালে নার্স হিসেবে নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানা কামাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তাহরিমা চৌধুরী ও দিলারা হারুন এ হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতেন।

## তথ্য আদান-প্রদানে নারীদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় তথ্যের আদান-প্রদান ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং কাজটি ঝুঁকিপূর্ণও বটে। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অনেক সাহসী নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে লিফলেট, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপানো এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানো ছিল জরুরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে এবং নটরডেম কলেজের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে লিফলেট ছাপানো হতো। কলাবাগানের এক বাড়িতে ডুপ্লিকেটিং মেশিনে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক পত্রিকা ছাপানো হতো (নাসরীন, ২২)। এসব ছাপানো ও বিতরণের কাজে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও অংশ নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবীদের চিঠিপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মুকুন্দপুর বর্ডার আউট পোস্ট (বি.ও.পি.)-টি ছিল ৩নং সেক্টরের অধীন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এই বি.ও.পি.-তে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্ত অবস্থান ছিল। ফলে মুক্তিবাহিনী এই বি.ও.পি. আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুকুন্দপুর বি.ও.পি. আক্রমণের মূল পরিকল্পনা করেন লেফটেন্যান্ট সাইদ (Nasim, 2002:98) । কিন্তু তিনি বার বার চেষ্টা করেও পাকবাহিনী ও তাদের সঠিক অস্ত্র সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছিলেন না। তেমনি একটি সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার পাহাড়পুর ইউনিয়নের গোয়ালনগর গ্রামের সায়েরা খাতুন নামে একটি মেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসেন। যদিও তাঁর পিতা আজিজ চৌকিদার ছিলেন একজন রাজাকার। সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রে সায়েরাকে হতে হয়েছিল মুকুন্দপুরের পাকিস্তানি সেনাদের ভোগ্যপণ্যে। প্রত্যয়ী সায়েরা দুর্ভাগ্যকে মেনে নেন নি, বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে লেফটেন্যান্ট সাইদকে এসে জানিয়ে দেন (হোসেন, ১৯৯৯:৩২৬) লেফটেন্যান্ট সাইদ সায়েরার তথ্য অনুযায়ী আক্রমণ পরিচালনা করেন। সায়েরার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আক্রমণটি নিখুঁতভাবে পরিচালিত হওয়ার ফলে পাকিস্তানি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং ২৮/২৯ জন বন্দি হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, গেরিলাযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়, শত্রুর কাছে যা সংবাদ পৌঁছায় এবং গেরিলা বাহিনীর কাছে যে সংবাদ পৌঁছায় তার মধ্যে পার্থক্য থাকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীরা যেসব যুদ্ধক্ষেত্রে গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন, সেগুলো ছিল অনেকাংশে নির্ভুল।

## কূটনৈতিক দায়িত্বে নারী

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে প্রবাসী বাঙালি নারী সমাজ ও দেশী-বিদেশী নারী সংগঠনের নেত্রীকর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংগঠক হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হচ্ছেন: ১. লুলু বিলকিস বানু, বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন; ২. শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু, পরিচালক, বাংলাদেশ এইড কমিটি, ভারত; ৩. মুন্নী রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল, লন্ডন; ৪. আমিনা পন্নী, আহবায়ক, বাংলাদেশ সাহায্য সংস্থা, সানফ্রান্সিসকো, আমেরিকা (নাসরীন, : ২০)।

১৯৭১ সালে ভারতের নারী ফেডারেশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম, মতিয়া চৌধুরী ও মমতাজ বেগম (কসবা) মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, পাশবিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে সারা ভারতে প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ২৪শে এপ্রিল ভারতের বোম্বেতে 'বাংলাদেশ

সহায়ক সমিতি' নামক একটি কমিটি গঠন করা হয়। সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় বেগম মাহবুবা নসরুল্লাকে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান ও শর্মিলা ঠাকুর এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ( আসাদ, ১৯৯৫: ৫৫)।

ভারতীয় নারী ফেডারেশনের নেত্রীবৃন্দ যথা অরুণা আসফ আলী, রেনু চক্রবর্তী, বিমলা ফারুকী, গীতা মুখার্জী, বানী দাস গুপ্তা, ইলা মিত্র, কল্পনা দত্ত, বিদ্যামুখী, নিবেদিতা নাগ প্রমুখ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সভা-সেমিনারের আয়োজন এবং প্রচার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। তাঁদের আহবানে ডব্লিউআইডিএফ নেত্রী ফ্রিডা ব্রাউন দিল্লিতে আসেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী সংগঠন 'মহিলা পরিষদ'কে সমর্থন জানান। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে অস্ট্রেলিয় দূতাবাসের সামনে পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অনশনরত জনগণের সঙ্গে নারী নেত্রী ফ্রিডা ব্রাউন, বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম যোগ দেন (বেগম, ১৯৯৫:৬১) ।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবহিত করে স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য অস্থায়ী সরকার তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট বরাবর প্রেরণ করেন। তাঁরা প্রথমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রা গান্ধী, তারপর প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরিসহ বিশিষ্ট মন্ত্রিবর্গ যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, স্পীকার ধীলম ও বিরোধী-নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর দিল্লীতে পার্লামেন্টের উভয় হাউসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। পত্রপত্রিকা তাঁদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে। ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৪ বৎসরের কারাদণ্ড ও তাঁর বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দণ্ডাদেশ জারি করেন। এবং পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কানাডাতে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান। বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংগঠক হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন ছিলেন নারী।

## স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আস্থা অর্জন করেছিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শব্দ-সৈনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ২৬শে মার্চ সকাল ৭:৩০ মি. চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীগণ বেতার কেন্দ্রটিকে

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করেন এবং নব উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন। বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এই কেন্দ্র থেকে প্রতি দিন সকাল, দুপুর ও রাতে তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হতে থাকে। এই কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ছিলেন (নাসরীন, : ১৯)। ইংরেজি সংবাদ-পাঠিকা পারভীন হোসেন, লেখিকা ও পাঠিকা বেগম মুশতারী শফী, সংবাদ-পাঠিকা নাসরিন আহমেদ শিলু, বদরুন্নেছা আহমেদ, আই ভি রহমান ও মেহের খন্দকার। সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেনঃ কল্যাণী ঘোষ, রুপা খান, মিতালী মুখার্জী, মালা খান, নমিতা ঘোষ, স্বপ্না রায়, রমা ভৌমিক ও উমা খান। এ ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিলারা হারুন, ছায়া রায় এ শিল্পীদের অন্যতম। তাঁরা ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান। বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে শরণার্থীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেন।

## গেরিলা যুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনা ও সহযোগী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর এলাকায় অপারেশন চালানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনী গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অফিস আদালতের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, বন্দর এলাকায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, যানবাহন চলাচলে প্রবিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও জনগণকে উজ্জীবিত করে আন্তর্জাতিক কূটনীতিক মহলসহ বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দলগুলো উপর্যুক্ত লক্ষ্যে অবিচল থেকে অত্যন্ত সার্থকভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এই সব দল কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে সামগ্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টিসহ নৌ-পথে বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করতেও অনেকাংশে সক্ষম হয়। এই বাহিনীগুলোকে প্রধানত ২নং ও ১০নং সেক্টরের অধীনে সংগঠিত ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য ২নং সেক্টরের অধীনে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'ঢাকা গেরিলা বাহিনী' গঠন করা হয়। যাদের মধ্যে 'ক্র্যাক প্লাটুন' অন্যতম (আরেফিন, ১৯৯৫: ৮২)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক সাহসী বধূ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান রেডক্রস এর মহাসচিব এম ফখরুল হোসেনের স্ত্রী ফেরদৌস আরা যুদ্ধের সময় শিশু বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঢাকায়

অবস্থান করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন তথ্য তাঁর বড় ভাই দুই নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নিকট প্রেরণ করতেন (মওদুদ, ১৯৮৫:৬২)। এক পর্যায়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব করেন আরেক বীরযোদ্ধা মনোয়ারের নিকট। মনোয়ার তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করে সেপ্টেম্বর মাসে ফেরদৌস আরাকে ঢাকার চামেলীবাগস্থ ফিল্ম সেন্সরবোর্ডে টাইমবোমা রাখতে বলেন। ফেরদৌস আরা সাথে সাথে রাজি হয়ে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ে বোরখা পরে নির্দিষ্ট স্থানে চলে যান। নির্দিষ্ট স্থানে বোমা রেখে চলে আসেন মালিবাগে। মালিবাগে আসার সাথে সাথে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং বিল্ডিং এর সিঁড়ি ভেঙ্গে যায়। এর পর তিনি বাসস্থান পরিবর্তন করে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানায় চলে আসেন। সেই সময় এই থানাটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল। পরবর্তীতে এখান থেকে তিনি যুদ্ধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

## উপসংহার

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ একসাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষের সহযোদ্ধা হিসেবে নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহস-নির্ভীকতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নারীরা শুধু অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি, তাঁরা সকল যোদ্ধাদের পরম মমতায় আগলে রেখেছেন সাহস যুগিয়েছেন। তাই বলা যায়, নারীর অবদান এ ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং গভীর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে নারীর অবদানকে আজও সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি, বরং শুধু লাঞ্ছনার সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধাবস্থায় ধর্ষিতা নারীর প্রতি আমরা দেখাতে পারিনি স্বাভাবিক উদারতা। এমনকি কোন কোন পরিবার তাদের ধর্ষিতা কন্যার হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। একজন নারী যোদ্ধার এ আত্মত্যাগ মূল্যায়ন করেনি দেশ, সমাজ ও সংসার— আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যাঁদের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা, গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

**তথ্যসূত্র**

Hassan, Zahir (1994), The Separation of East Pakistan, Karachi: Oxford University Press.

Islam, Major Rafiqul (1981), A Tale of Millions, Dacca: Bangladesh Books International.

Khan, Air Marshal Asgor (1983), Generals in Politics, Pakistan, 1958-1982, Dhaka: University Press Limited.

Muhit, Abul Mal Abdul (1996) American Response to Bangladesh Liberation War, Dhaka: University Press Limited.

Shafiullah, maj Gen. K.M. (1989), Bangladesh at War, Dhaka: Academic publishers.

Biswas, Sukumar (2005), Mujibnagar Government Documents 1971, Dhaka: Mowla Brothers

Biswas, Sukumar (2007), History From Below 1971, Dhaka: Muktijuddha Gabeshana Kendra.

Nasim, A.S.M Bir Bikram (2002), Bangladesh Fighters for Independence, Dhaka:Columbia Prokashani.

Ahmed, Moudud (1990), Bangladesh: Era of Sheik Mujibur Rhaman, Dhaka: University press Limited.

Government of India (Foreign Ministry), Bangladesh document, New Delhi 1971.

রহমান, হাসান হাফিজুর (১৯৮৩), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

খানম, আয়শা (২০০১), মুক্তিযুদ্ধদিনের স্মৃতি, ঢাকা, ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ।

হোসেন, সলিনা (১৯৯৯), সংগ্রামী নারী যুগেযুগে, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ।

রহমান, মো. মাহবুবুর (২০০৩), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: সময় প্রকাশন ।

বেগম, ফোরকানা( ১৯৯৮), স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী, ঢাকা :সুমি প্রিটিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ।

হোসেন, জয়দুল, (১৯৯৯), মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংরক্ষিত ।

আরেফিন, এ.এস.এম সামছুল (১৯৯৫), মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, ঢাকা :ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ।

নাসরীন, নূরে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নারী, অপ্রকাশিত ।

আসাদ, আসাদুজ্জামান (১৯৯৫), মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনী, ঢাকা: সময় প্রকাশন ।

বেগম, মালেকা (১৯৯৫), একাত্তরের নারী, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী ।

মওদুদ, বেবী (১৯৮৫), মুক্তিযুদ্ধে এক সাহসী কন্যা' রোববার , সাপ্তাহিক, ১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যা ।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# ইসলামী অর্থব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা

*মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন*[১]
*এ কে এম মতিনুর রহমান*[২]
*মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন*[৩]

***Abstract:*** *Islamic economic system is a system of economy where in total economic system is designed and implemented according to the Holy Quran and Sunnah and which gives highest importance to fulfil the basic requirements of men in the siociety. Due to corelessness of capitalistic and socialist and mixed economic system in the present day world, the islamic economic system has been gaining importance for its pragmatic prescription and commitment to the mankind. The article highlights different important components of islamic economic system which are basic to it such as characteristics of islamic economic system, objectives of islamic economic system, some basic components of islamic economic system i.e, capital, labour, property ownership, resource distribution policy, zakat, interest, free trade, employer-employee relations etc. In conclusion it has been suggested that materalization of islamic economic system can create a congenial atmosphere in the society for physical and spiritual development of mankind.*

## ভূমিকা

মানুষের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার মত মৌলিক সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি ও সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতে থাকে। এইসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলাম এমন এক অর্থব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়েছে যা সব সময় যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিষয়সহ সকল মানবিক বিষয়েই সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। গতানুগতিক সেকুলার ধারণা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক মতবাদ মানব জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তো দিতে পারেই না বরং সমস্যার পরিধি আরো বাড়িয়ে তোলে। নীতি ও আদর্শহীন বস্তুবাদী দর্শন, স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য, সুদব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণে উদ্ভুত হয়েছে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক,

১ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্টনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
২ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্টনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
৩ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্টনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

রাজনৈতিক, মানাবিক ও পরিবেশগত সমস্যা। এ থেকে মুক্তির অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে সুষ্ঠু ইসলামী অর্থব্যবস্থার সথে অর্থনীতিকে সম্পূণভাবে সম্পৃক্ত করা । এ লক্ষ্যে ইসলামের প্রতিটি অর্থনৈতিক অঙ্গন সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর যে ব্যাখ্যা তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে । ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিটি শাখা-অনুশাখা অন্য শাখা-অনুশাখার সাথে পারস্পরিক নির্ভরশীল। যে কোন একটি শাখার যথাযথ বাস্তবায়ন নির্ভর করে অন্যান্য শাখার কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। অন্যথায় ইসলামের যে সামগ্রিক অগ্রগতি, সাফল্য তা পূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতি কুরআন ও সুন্নাহতে বিবৃত আছে। ইসলামী অর্থনীতি ঈমানদার লোকের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে, এবং যা মুমীনদের জনহিতকর কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপরই বেশি জোর দেয়। মানব কল্যাণের ধারণা কখনই কুরআনের বিশ্বজনীন নৈতিকতার বাইরে যেতে পারে না।

## প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

ক. ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করা ।

খ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজে কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করে তা ব্যাখ্যা করা।

গ. প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কিভাবে শ্রেষ্ঠ তার পক্ষে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য উপস্থাপন করা ।

## প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাত্ত্বিক ধারণা

**ইসলাম:** ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি । এর অন্য অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্বে সমর্পণ করা। অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন সম্ভব। যে পথ ও পাথেয়কে অবলম্বন করে মানব জাতি তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে পারে তার নাম ইসলাম[১]।

**ইসলামী অর্থব্যবস্থা :** মানুষের পার্থিব প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভূমিকা অতীব মৌলিক । বস্তুতপক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়ন অপূর্ণ থেকে যাবে যদি-না সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রয়োগ ঘটে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের এক মজবুত কাঠামো।

"Islamic Economy is a social science which studies economic problem of the people in the light of Islam"[2]

"The first premise which we want to establish is that economics in an Islamic framework, operates with its feet firmly rooted in the value pattern embodied in the Quran and the sunnah'[3].

ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি ব্যাপক বিষয় । এ প্রবন্ধে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন সম্পদের মালিকানা, সম্পদ বণ্টন, আয়-উপার্জন, উৎপাদন, বায়তুলমাল, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে ।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত সম্পর্কিত আকিদার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভাবতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নবী (সা.) শাফাআত লাভ। যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হবে না, সে কাজে নবী (সা.) শাফায়াত লাভ হবে না, সে সব কাজ ইসলামী অর্থনীতির আওতা বহির্ভূত ।

**ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজের স্থান নেই**

- ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ সাধনের পথ নির্দেশ করে;
- ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত;
- ইসলামী অর্থনীতি আদর্শ সমাজ জীবনের পথ নির্দেশ করে;
- ইসলামী অর্থনীতি সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ এবং জনকল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করে;
- ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল-হারাম বেছে চলা হয় ।

**ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য:**

১. সম্পদের ন্যায় ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা ।
২. ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ।
৩. মানব ও ব্যক্তিগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ।
৪. সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ।
৫. সামাজিক ও সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া ।
৬. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।
৭. যাকাত-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ ।
৮. অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নৈতিক উন্নয়ন সাধন ।

## ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কিছু বিষয়

মানুষের জৈবিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইসলাম সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন এবং ব্যয়ের বৈধ-অবৈধ পন্থাগুলো সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যাতে মানবজাতি চলার পথে বিভ্রান্ত না হয়। মানুষের বহুবিধ চাহিদার মধ্যে অর্থনৈতিক চাহিদা যেহেতু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু সমাজে কোন ব্যক্তি অধিকতর সুবিধাভোগী হতে না পারে এবং অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বঞ্চিত না হয় সেজন্য ইসলাম অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করেছে যাতে একজন মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বৈধ উপায়ে সম্পদ আহরণ, অর্জন, ভোগ এবং সাথে সাথে উপার্জিত সম্পদে সংশ্লিষ্ট অন্যদের অংশ প্রাপ্তি বা ভোগের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মুনাফা, মূলধন ও শ্রম সম্পর্কে ইসলামের আলোকে কিছু ব্যাখ্যা:

### মুনাফা

- ব্যবসা বাণিজ্যে পূর্ণ সততা অবলম্বন।
- অধিক মুনাফা অর্জন লক্ষ্য না হওয়া।
- পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা না করা।
- খারাপ জিনিস দিয়ে ভাল জিনিসের মূল্য না নেয়া।
- ওজনে কম দেয়া থেকে বিরত থাকা; এবং
- মুনাফার উদ্দেশ্যে মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরী না করা।

### মূলধন

প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে মানুষের শ্রম যোগ হলে সম্পদ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ও উপার্জিত এ সম্পদকে আরো অধিক লাভের আশায় অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করলে তখন তাকে বলে মূলধন। ইসলামী অর্থনীতিবিদরা মূলধনের প্রাপ্য মনে করেন লভ্যাংশকে, সুদকে নয়। ইসলাম ভোগের পরিমাণ কমিয়ে সঞ্চয় করতে বলে। সঞ্চিত অর্থ জমা রাখলে চলবে না বরং তা ব্যয় করতে হবে আল্লাহর রাস্তায়।

"তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশভূষা গ্রহণ কর এবং খাদ্য, পানি পান কর ও অপব্যয় কর না, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না" (সুরা আল আরাফ-৩১)

দুটি উপায়ে তা সম্ভব ১) যাকাত, সদকা, ফিতরা, কাফফারা ইত্যাদি বেশি বেশি করে আদায় করা; এবং ২) বাকি অর্থ শিল্প বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা।

## শ্রম

ইসলামী অর্থনীতিতে দুনিয়া বা আখেরাতের পারিশ্রমিক বা পুণ্যের আশায় যে দৈহিক বা মানসিক শক্তি খাটানো হয় তাকে শ্রম বলে। মানবজাতির কল্যাণ, নৈতিকতার উন্নয়ন, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অবক্ষয় রোধে বস্তুগত ও অবস্তুগত উৎপাদন কার্যে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পছন্দনীয় তাতে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির ব্যবহার হয় তা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সব নীতিমালা দিয়েছেন তা নিম্মরূপ:

১. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে কারো স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়
২. যাকাত প্রদান;
৩. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়;
৪. সুদ ও সুদী লেনদেন বন্ধ করা;
৫. ব্যবসায়ে সকল প্রকৃতির প্রতারণা পরিহার করা;
৬. অপ্রয়োজনে সম্পদের মজুদ গড়ে না তোলা;
৭. হারাম বস্তু উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থাকা;
৮. মুনাফাখোরী ব্যবসা ও লেনদেন থেকে বিরত থাকা;
৯. সমাজে বৈধ সম্পদের অব্যাহত সঞ্চালন নিশ্চিত করা;
১০. ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যে সম্পদ রেখে যায় তা নিকট ও দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ইসলামে বিধিবদ্ধ নিয়মে বণ্টন করা।

## ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা

ইসলামী দৃষ্টিতে সম্পদের যিনি স্রষ্টা তিনিই তার মালিক। সম্পত্তি ভোগ করতে দেয়ার অধিকারও আল্লাহ প্রদত্ত। তাই মানুষ আল্লাহর আদেশ ও অনুমোদনক্রমে সম্পদ ভোগ করতে পারে। মানুষের পক্ষে সম্পদে আল্লাহর অছিগিরিকে মানুষের আপেক্ষিক মালিকানা বলা যেতে পারে। ফিকাহর পরিভাষায় মালিকানা হচ্ছে মানুষ ও বস্তুর মধ্যে শরিয়ত সম্মত সম্পর্ক। মানুষ বৈধ নিয়মে যা অর্জন করে মানুষকে তার "মালিকানা" প্রদান করা হয়েছে যদিও তা আল্লাহর ন্যায়সংগত সম্পত্তি। ব্যক্তি, সমষ্টি, বা রাষ্ট্র তার মালিকানা ভোগ করে এবং আল্লাহ সম্পদ ভোগ করতে দিয়ে মানুষের প্রজ্ঞা, দায়িত্ববোধ এবং তার নিজের ও সমাজের সর্বাধিক কল্যাণে সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের যোগ্যতা পরীক্ষা করেন।

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদের যে ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর" (সুরা হাদীদ-৭)

"ইসলামী আইনমতে প্রকৃত মালিকানা বলতে বুঝায় যে সম্পদ আইসঙ্গতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমান মালিক কুরআনি আইনের যথার্থ সীমা অনুযায়ী নিজের ইচ্ছেমত সে সম্পদ ব্যবহার ও বিক্রি করার অধিকার রাখেন"[৪]।

এ পৃথিবীতে যাবতীয় সম্পদ, দ্রব্য সামগ্রী, নিয়ামত সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত ও নিয়োজিত হবে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে ধরনের নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানার ধারণা পোষণ করে ইসলাম তা করে না। ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তি মালিকানার ধারণা নিরঙ্কুশ নয় এমনকি নিঃশর্তও নয়। ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা হলো আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদের সংরক্ষণ, আমানতদারী ও তা ভোগ ও দানের অধিকার।

কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে—

> আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই, আল্লাহরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয় (সুরা আল-ইমরান-১০৯)
>
> আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহরই মালিকানাধীন (সুরা বাকারা-২৮১)
>
> নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সুরা তাগাবুন-১)

মানুষ আল্লাহর দেয়া সম্পদ পেয়েছে দান হিসেবে, সেই সাথে পেয়েছে সম্পদ ভোগ, ব্যবহার ও বিলি বণ্টনের বৈধ নিয়ম। সেই সম্পদ নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করার কোন অধিকার আল্লাহ মানুষকে দেননি। মানুষ সেই সম্পদ নিয়ে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে শুধু এই জন্যে যে আল্লাহ তাকে তা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাই মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কাজেই মুমীনরা এই সব জিনিসের মালিকানা দাবী বা নিজেদেরকে এসবের মালিক মনে করতে পারেন না।

আর ইসলামী অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও তাদের মালিক বলা যেতে পারে না। আল্লাহ মানুষকে এই দুনিয়ায় খলিফা রূপে সৃষ্টি করেছেন। সে ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাঁর বিধানের মধ্যে থেকেই তা সে ব্যয় করতে পারে। মানবসত্তা পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে কার্যকর ভাবে পালন করতে পারে সেজন্য তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বস্তুগত সম্পদে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা এ বিশ্বকে যে সম্পদে

সমৃদ্ধ করেছেন তা সীমাহীন। দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবহার করলে সকলের কল্যাণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তা যথেষ্ট। এসব সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে একজন মানুষ তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে।

## সম্পদ বণ্টন নীতি

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে- "লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তাহারা ব্যয় করিবে? বল, যাহা উদ্বৃত্ত'। তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যাক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ণ ব্যাক্তিস্বার্থকে এবং বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, বরং কোন অঞ্চলের সম্পদে শুধু সে অঞ্চলের লোকেদের কায়েমী স্বার্থকে ও ইসলাম স্বীকৃতি দেয়নি। দারিদ্র বা সম্পদের স্বল্পতার অজুহাতে কারো সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয় না। প্রত্যেককেই কম-বেশী সমাজের জন্য ব্যয় করতেই হবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবন উপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদাপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি কাহারও উপর চাপান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

> আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করি না (সুরা আল আরাফ-৪২)
>
> আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা উপার্জন করে তা তার উপরই বর্তাবে (সুরা আল বাকারা-২৮৬)

ইসলামী সমাজে সম্পদ ও আয় বণ্টন নীতি অন্যান্য সব সামাজিক বণ্টন রীতির তুলনায় অনেক বেশি মানবিক ও কল্যাণকর। ইসলামে এ পর্যায়ে বিধি-বিধান কার্যকরকরণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর ভূমিকার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

> সম্পদ যেন শুধুমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হতে থাকে (সুরা হাশর-৭)

হালাল ও বৈধ উপায়ে যে সম্পদ উপার্জন করা হয় উপার্জনকারী তার অধিকারী হবে। আল্লাহ আরো বলেন, " তোমরা যা উপার্জন কর তা তোমাদের, আর মহিলারা যা উপার্জন করে তা তাদেরই" (সুরা আন নিসা-৩২)। একের উপার্জিত ধন অন্যায়ভাবে কেউ নিতে পারে না।

আল্লাহ বলেন,

> তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না (সুরা আন নিসা-২৯)

কারণ কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়লে সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করবে এবং এতে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে । মানুষের মৌলিক মানবিক অভিন্নতা ও পূর্ণ সাম্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে মেধা ও কর্মদক্ষতা সব মানুষের সমান নয়। ফলে মানব জীবনের জন্য একান্তই অপরিহার্য জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়ে যাওয়া। কিন্তু আল্লাহ্ যে বিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নাযিল করেছেন, তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থব্যবস্থা কার্যকর হলে মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে জীবন যাপনে এতসব অসুবিধার সম্মুখিন হবে না— অর্থাৎ :

১. সম্পদ উপার্জন ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে শরীয়তসম্মত পন্থা ও উপায় অবলম্বন;
২. শোষণ, নির্যাতনমুক্ত উপার্জনের বাধ্যবাধকতা আরোপ।
৩. সম্পদকে কেবলমাত্র মালিক বা আমানতদারের নিজ সুখ সম্ভোগে নিঃশেষিত না করা। অন্য লোকের উপার্জিত সম্পদ, ঘুষ বা পণ্য মজুদকরণের পন্থায় ব্যবহার না করা।
৪. ধন-সম্পদের প্রকৃত ও আসল মালিকের মর্জি ও নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার ও বণ্টন।

রাসুলে করীম (সা.)-এর যুগে ধন বণ্টনে যে অসমতা স্বাভাবিক কারণেই হয়ে যেতো তার প্রতিরোধ করা হয়েছে তিনটি উপায়ে:

১. প্রতি বছর যাকাত ও প্রতি মৌসুমে উশর বণ্টন দ্বারা।
২. 'ফাই' সম্পদ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, মিসকিন, অসহায়, ইয়াতীম, নিঃসম্বল পথিকদের মধ্যে বণ্টন।
৩. আর্থিক সাহায্যদান, সদকা, ফিতরা ইত্যাদির মাধ্যমে ধনশালীদের উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত করা।

**ইসলামে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা**

বণ্টন প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১) সরকারি পর্যায়ে হস্তান্তর এবং ২) ব্যক্তিগত পর্যায়ে বণ্টন।

ক) হস্তান্তরের মাধ্যমে সম্পদ প্রাপ্তি- ইসলামী রাষ্ট্র শরীয়ত মোতাবেক নিম্মলিখিত সম্পদ জনসাধারণের কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

১. যাকাত ২. উশর ৩. খারাজ ৪. গনীমত ৫. লাওয়ারিশ সম্পত্তি ৬. অন্যান্য কর।

খ) হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বণ্টন- এ পর্যায়ে সরকার জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সম্পদ জনসাধারণের অনুকূলে হস্তান্তর করেন।

২. ব্যক্তিগত পর্যায়ে হস্তান্তর প্রক্রিয়া—ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ হস্তান্তর প্রক্রিয়া দু'রকম—বাধ্যতামূলক হস্তান্তর এবং ঐচ্ছিক হস্তান্তর।

ক) বাধ্যতামূলক হস্তান্তর- মীরাস বা উত্তরাধিকার, যাকাত, উশর ও খারাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

**মীরাসঃ** মৃত ব্যক্তির আত্নীয়-স্বজন মীরাস পায়। আল্লাহ বলেন, "পিতা-মাতা ও নিকট-আত্নীয়গণের ফেলে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অংশ আছে নারীদেরও অংশ আছে। সে অংশ সুনির্দিষ্ট, কম হোক বা বেশি হোক।"

**যাকাতঃ** ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের ও অধিকার বা অংশ রয়েছে তার সম্পত্তির উপর। সেজন্য ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাতকে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দেয়া হয় বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে গরীবদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার (দৈহিক, মানসিক বা বাইরের কোন অসুবিধা যেমন বেকারত্ব) ফলে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দেয়া যাতে যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তন না করে।

যাকাত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি। প্রবৃদ্ধি, লাভ, প্রবৃদ্ধির কারণ হওয়া ইত্যাদি যা আল্লাহ প্রদত্ত 'বারাকাত' থেকে অর্জিত হয়। কুরআন মজীদের ১৮টি আয়াতে শব্দটির উল্লেখ বা ব্যবহার দেখা যায়। যাকাত হচ্ছে ব্যক্তির আয়ত্বাধীন ধন, মাল ও সম্পদ সম্পত্তির উপর আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানা স্বীকারের বাস্তব অনুষ্ঠান।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ দুটি প্রান্তিক পর্যায়ের শোষণ ও বঞ্চনামূলক অর্থ ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি মধ্যম ও বাস্তববাদী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ধার্য করেছে। তা ফরয বা বাধ্যতামূলক। এর ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটি বিরাট অংশ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্র ব্যক্তিদের হাতে চলে যায়। যার ফলে দরিদ্রের জীবনমান উন্নত হয়।

ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোন ধর্মই ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি আইন প্রণয়ন করে যাকাত প্রদান, বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ইয়াতিম ও নিঃসম্বলদের লালনকে পবিত্র করেনি।[৫] আল্লাহ পাক সম্পদশালীদের জন্য তার সম্পদের উপর বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। অর্জিত যে কোন সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান না করা পর্যন্ত মুমীনের নিজ অর্জিত সম্পদের ভোগ বৈধ হয় না।

কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে—

"তাদের ধনসম্পদে রয়েছে হক ভিক্ষার্থী ও বঞ্চিতদের" (সুরা যারিয়া- ৩, )

ইসলাম সামাজিক শ্রেণী—বৈষম্য দূর করার জন্য যাকাতের বিধান রেখেছে। যাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ হতে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। দারিদ্র দূরীকরণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ প্রদত্ত যাকাতের বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন। যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির ফলে দরিদ্রের জীবনে যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আসে তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

> "তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি এর মাধ্যমে সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং বরকতময় করতে পারো"। (সুরা তওবা-১০৩)
>
> "সম্পদশালীদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত প্রার্থীর ও বঞ্চিত উভয় শ্রেণীর লোকদের হক রয়েছে। (সুরা জারিয়াহ-১৯)

**যাকাতের মূলনীতি**

১. বিশ্বাস বা ঈমান: আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) এর উপর ঈমান থাকলে তবেই ইবাদতের প্রশ্ন আসে। যাকাত একটি আনুষ্ঠানিক আর্থিক ইবাদত

২. সমতা: সমতার ভিত্তিতেই যাকাত আদায় করা হয়। সম্পদের তারতম্যের কারণে যাকাতের হারে বিভিন্নতা আছে বটে কিন্তু যাকাতের প্রত্যেকটি হারই প্রত্যেক যাকাত দাতার উপর সমতার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়।

৩. যৌক্তিকতা: যাকাত একটি ইবাদত। ইবাদত ফরজ হয় সুস্থ, সাবালক, বিবেকবান মুসলমানের উপর।

৪. সুবিধা: মালিকে নিসাব না হলে যাকাত ফরজ হয় না। "যাকাত আইন অনুযায়ী সম্পদ উক্ত স্থিরীকৃত সম্পদের পরিমাণের কম হলে বা কম মূল্যের হলে কোন অবস্থাতেই তার যাকাত আদায় করা যাবে না। ইসলামী আইন শাস্ত্র অনুযায়ী ন্যূনতম করযোগ্য সীমাকে বলা হয়েছে নিসাব অর্থাৎ মূল বা শুরু বা সীমা- যেখান থেকে যাকাতের করারোপ শুরু হয়। এ নিসাব বা ন্যূনতম করসীমাকে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা:) যাকাত আইনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন"[৬]।

৫. স্বাধীনতা : স্বাধীন মানুষের জন্যই যাকাত, ক্রীতদাসদের যাকাত নেই।

উশর : যাকাতের মত উশরও বাধ্যতামূলক হস্তান্তর। এটা হচ্ছে একজন মুসলমান জমির মালিক কর্তৃক ইসলামী সরকারের অনুকূলে হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ।

**খারাজ :** উশরের মত খারাজও কৃষিজমির উৎপন্ন ফসল থেকে ইসলামী সরকারকে প্রদেয় একটি সম্পদ, যা অমুসলমান কৃষক কর্তৃক প্রদেয়। মুসলমানদের উপর উশর ধার্য করা হয়, খারাজ নয়।

**ফিতরা :** এটাও একটি বাধ্যতামূলক দান যা প্রত্যেক মালিকে-নিসাবকে আদায় করতে হয়। ফিতরার ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর জমা রাখতে হয় না। মালিকে-নিসাব তার নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ফিতরা আদায় করবেন।

**জিযিয়া :** জিযিয়া হচ্ছে অমুসলিম নাগরিক কর্তৃক ইসলামী সরকারকে দেয় সামরিক কর। প্রতিটি অমুসলিমকে এ কর দিতে হয়; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, পাদ্রী, ধর্মযাজক, নারী ও শিশু ছাড়া।

**খ) ঐচ্ছিক হস্তান্তর** -এর মধ্যে রয়েছে,

১. **হিবা:** রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা উপহার দাও তবে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। এ পদ্ধতিতে সম্পদ হস্তান্তর হয়।

২. **অসিয়্যত:** মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি অসিয়্যত করা যায় তবে তা কোন অবস্থাতেই

উত্তরাধিকারীগণকে বঞ্চিত করে নয়। মোট সম্পত্তির $^1/_3$ অংশ পর্যন্ত অসিয়্যত করা যায়।

৩. **ওয়াকফ:** এর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ কল্যাণের জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায়। হালাল উপায়ে উপার্জন, উৎপাদন ও হালাল পথে ব্যয়।

ইসলামী সমাজ তার উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে বণ্টনমূলক সুবিচার কর্মসূচির অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে সমাজের সকল সদস্যের মানবিক মর্যাদা অনুযায়ী জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজে তাদের প্রকৃত অবদানের বা সেবার ভিত্তিতে বিভিন্ন মানের উপার্জনের স্বীকৃতি দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজকে প্রদত্ত অবদানের জন্য সমাজ নির্ধারিত মূল্যমানের রোজগার করার সুযোগ পায়।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে যদিও কাজের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তার কর্মদ্যোগের স্বাধীনতা রয়েছে, সে অর্থোপার্জন ও তা দখলে রাখার অধিকার পেয়েছে। তবু প্রকৃত সত্য হল এই যে, সে অর্জিত সম্পদের নিছক একজন আমানতদার মাত্র। সে কেবল তার সম্পদ, তার আমানতের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তার উপার্জন করার, বিনিয়োগ করার ও ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধন-সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে নারাজ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য শরীয়তের যে বিধান দিয়েছেন তার মাধ্যমে উপার্জন ও মুনাফা লাভের এমন সব উপায় ও পন্থা হালাল করেছেন যার ভিত্তিতে তাদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধিত এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।

মহানবী (সা.) বলেন, "কারো জন্য নিজের হালাল উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য নেই" (বুখারী)। আল্লাহ ঘোষিত হালাল উপার্জনের পন্থাসমূহের শীর্ষস্থানে রয়েছে ব্যয়, ক্রয়-বিক্রয়। আর হারাম ঘোষিত উপায় বা পন্থাসমূহের প্রধান হচ্ছে 'রিবা' অর্থাৎ সুদ। ক্রয়-বিক্রয় যদি আল্লাহর নাফরমানী কোন কাজের সাহায্যকারী হয় কিংবা কোন হারাম কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তাহলে সে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নয়। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা হল মানুষ অর্থের গোলাম নয়। অর্থ তাকে উপার্জন করতে হবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য; শুধুমাত্র অর্থ সম্পদের জন্যই বেঁচে থাকা নয়। এজন্য ধন-সম্পদ উপার্জনের যেসব পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই, সেসব পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জন করা যাবে না। রাসুলে কারীম (সা.) উপার্জন এবং উৎপাদনের জন্য কেবল উৎসাহই দেননি পাশাপাশি উৎপাদনের বিভিন্ন পথ ও পন্থা বলে দিয়েছেন। যেমন: জীবজন্তু, বৃক্ষ-গুল্ম, জড় পদার্থ, শিল্প-পরিবেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। মহানবী (সা.) লোকদের মৎস্য শিকার, জীবজন্তু শিকার, পশুপালন,

পশুর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি থেকে জীবিকা নির্বাহের উপদেশ দিতেন। তিনি জঙ্গল কাটা, কৃষিকাজ, উদ্যান তৈরি—প্রভৃতি পন্থায় সম্পদ উৎপাদনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া তিনি জড় পদার্থ এবং খনিজ সম্পদ থেকেও সম্পদ আহরণের আহবান জানান।

কুরআনে বলা হয়েছে,

> আর তিনিতো সাগরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন, যাতে তোমরা তাহা হতে মৎস্য, মাংস আহরণ করতে পারো। আর আহরণ করতে পারো ব্যবহার্য অলংকারাদি (সুরা নাহল-১৪)

আল্লাহ্ এরশাদ করেন "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সালাত সমাপ্ত হলে জমীনে ছড়িয়ে পড়, আর অন্বেষণ কর আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ" (সুরা জুমআহ-১০)

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং তোমরা সেই জিনিস থেকে ব্যয় করো যাতে তিনি তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য বিরাট শুভ ফল রয়েছে" (সুরা আল হাদ-৭)।

আল্লাহর মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পদ ও উপকরন মানুষ আমানত স্বরূপ লাভ করে, উপার্জন করে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে।

> হে মুমীনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করেছি তা থেকে (সুরা আল বাকারা-২৬৭।

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবার দরুণ সমাজের লোকদের হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি কমে যাবে। কেননা অন্য ব্যক্তির নিকট রক্ষিত জিনিস পাওয়ার ইচ্ছা যে-কারো মনে জাগতে পারে। তা পাওয়ার জন্য আইনসম্মত বৈধ ও সর্বজনস্বীকৃত কোন পন্থা কার্যকর না থাকলে অবৈধ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী যে কোন একটি পন্থা সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মানবপ্রকৃতি-নিহিত এ চাহিদা পরিপূরণের আইনসম্মত পন্থা হিসেবে আল্লাহ্ বিনিময়ের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের এ ব্যবস্থা হালাল ঘোষণা করেছেন।

### সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী কোন কোন শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা যায় তা আগেই উদ্যোক্তাকে ঠিক করতে হবে। কারণ শরীয়ত অনুমোদিত নয় এমন দ্রব্য ইসলামী অর্থনীতিতে কোন উদ্যোক্তা উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারে না। কেননা শুধু হালাল বস্তু ব্যবহারের নির্দেশই ইসলাম দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (সুরা বাকারা-১৬৮)।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী উদ্যোক্তা মূলধন দাতাকে লাভের অংশ দিয়ে মূলধন সংগ্রহ করে এবং সে সুদের উপর কোন ঋণ গ্রহণ করে না। কুরআনুল করীমে এসেছে, "হে ঈমানদারগণ, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক" (সুরা বাকারা-২৭৮)।

উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভূমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরী ও মূলধন দাতাকে পূর্ব-নির্ধারিত আলোচনার ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রদান করেন। কেননা মজুরী না দেওয়া জুলুম।

উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রি-বণ্টন, ভূমির খাজনা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রদানের দায়িত্ব উদ্যোক্তার। কেননা, আল-কুরআনের নির্দেশ, "মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" (সুরা শুআরা-১৮১)।

আল-কুরআনে অসংখ্য স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রিয় নবী (সা.) এর নিকট ব্যবসায়ীদের সে মর্যাদা রয়েছে, তা হচ্ছে "সত্যবাদী মুমীন ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন (নবী সিদ্দীক) ও শহীদগণের দলভুক্ত" (মিশকাত)।

**কোরআন মজীদে ব্যবসা সম্পর্কে বলা হয়েছে-**

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যে ব্যবসায় এবং ক্রয়-বিক্রয় লোকদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল করে না" (সুরা নুর-৩৭)। ইসলাম এভাবে প্রত্যেককে বৈধভাবে সম্পদ অর্জনের শিক্ষা দেয়। নামাজের পর রিযিকের সন্ধানে জমিনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেন, "বৈধ জীবিকা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"

হযরত উমর (রা.) বলেন, "তোমাদের কারো জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকা উচিত নয়।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহর প্রদত্ত রিযিক চেষ্টার মাধ্যমে তালাশ কর এবং পরনির্ভরশীল হয়ে থেকো না।" তবে অত্যধিক মুনাফা গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ, কেননা তা এক ধরনের শোষণ। হাদিসে রয়েছে-"যে মুসলিম অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল, সে তাকে প্রতারিত করল, সে বড়ই

অপরাধী।" সুদ অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদই হচ্ছে চাবিকাঠি। সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় অসমতা বাড়িয়ে তোলে। সুদের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

> তারা বলছে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন (সুরা বাকারা-২৭৫)

কিন্তু সুদী লেনদেনে মূল ঋণের পরিমাণ থেকে যে বাড়তি নেয়া হয়, তাকে রিবা বলে; তাকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। সুদ হারাম করা হয়েছে এজন্য যে, তাতে মূল ঋণের চেয়ে অতিরিক্ত দিতে হয়। যার বিনিময়ে দাতা কিছুই পায় না। সুদ গ্রহণকারীর লক্ষই থাকে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলেই তার লগ্নী করা টাকা গ্রহণ করা। ঋণগ্রহণকারী তা দিতে বাধ্য কোন ফায়দা ছাড়াই। সুদ শোষণের হাতিয়ার। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় মানুষ শোষিত হতে বাধ্য। এই সুদ পুঁজিবাদী সমাজের মূল ভিত্তি। রাসুল (সা.) বিদায় হজ্বের বাণীতে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুদহীন সমাজ ও লাভ লোকসানের ভিত্তিতে আজও যৎকিঞ্চিত যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয় তাতে সুদভিত্তিক ও শর্তভিত্তিক অবস্থাগুলোর চেয়ে মানুষের কল্যাণ অনেক বেশি হয়।

### বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের যে অর্থ প্রশাসন ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বায়তুলমাল। রাসুল (সা.) বিভিন্ন উৎস থেকে বায়তুলমালে প্রাপ্ত অর্থ ও আয় পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কারণ এর প্রতিটি উৎসের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ইসলামের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল বায়তুলমাল। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাসুলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের নিকট থেকে রাজস্ব হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এখানে জমা হত এবং এখানে থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মিটানো হয়। সারা বছরের ব্যয় বহনের পর যে অর্থ রাজকোষে উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়েই জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। বায়তুলমালে সঞ্চিত সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। কেউ যাতে মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। যাকাত নির্ধারিত আট শ্রেণীর জনগণের চাহিদা পূরণ না হলে বায়তুলমাল

থেকেই তাদের সাহায্য প্রদান করা হত। খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে বায়তুলমাল একদিকে দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম, দরিদ্রদের কল্যাণে ভূমিকা পালন করে; অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বায়তুলমাল।

## মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্বান ব্যক্তি-কল্যাণধর্মী শ্রমনীতি প্রবর্তন ইসলাম তথা মহানবী (সা.) এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ অবদান। মহানবী (সা.) নিজে পরিশ্রম করেছেন এবং শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের প্রেরণা দিয়ে জাতীয় উন্নতি সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শ্রমক্ষেত্রে বিবদমান সমস্যাসমূহ চিরতরে দূরীকরণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু শ্রমনীতি তৈরী করেন; যেখানে রয়েছে শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল—ইসলাম নিয়োগকারী ও নিয়োগপ্রাপ্ত উভয়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পন্থা ঠিক করে দিয়েছে। শ্রমিককে তার কাজ অনুযায়ী ন্যায্য মজুরী দিতে হবে এবং একজন নিয়োগকারী মুসলিম মালিক তার শ্রমিককে শোষণ করতে পারবে না। সুতরাং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সকল প্রকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইসলাম মালিকের প্রতি যেমনিভাবে অনেকগুলো কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনি শ্রমিকের প্রতি নির্দেশ রয়েছে কর্তব্যপরায়ণ, যত্নশীল, সৎ ও বিশ্বস্ত হতে। এটা সম্ভব হবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে পরস্পরের সহযোগিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা, পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মনীতি, ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ, সুবিচার ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রাধান্য ইত্যাদির মাধ্যমে। শ্রমকে আধুনিক বিশ্বে যেখানে ঘৃণার কাজ মনে করা হয় সেখানে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, "নিজ হস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর নাই" (বুখারী)। তিনি আরো বলেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তা খেতে পরতে দিতে হবে। শ্রমিকদের শ্রমের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে যতটুকু বিশ্রাম দরকার ততটুকু বিশ্রাম করার অধিকার দেয়া মালিকের কর্তব্য। ইসলাম শ্রমিকের নিয়মিত বিশ্রামের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং মালিককে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রমিকদের উপর অত্যধিক কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। শ্রমিকগণ যে পরিমাণ কাজ সহজ ও সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে, যে পরিমাণ কাজ করা তাদের সাধ্য ও শক্তিতে কুলাবে, তাদেরকে সে পরিমাণ কাজেই নিযুক্ত করতে হবে।

ইসলামে সর্বজনীন মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি হল—ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে। মহানবী (সা.) বলেন, "মজুরী ও শ্রমিকের খাদ্য ও বস্ত্র দিতে হবে মালিকের তথা রাষ্ট্রের" (বুখারী)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের বিচারের দিনে আমি তিন ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হব। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে, "যারা শ্রমিকদের কাছ থেকে পূর্ণ কাজ নিয়েছে, কিন্তু নিয়মিত ভাতা দেয়নি"(বুখারী)। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মহানবী (সা.) শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকারকে সমুন্নত রেখে যে শ্রমনীতি প্রবর্তন করেছেন, তা যদি মালিক ও শ্রমিক উভয়ই মেনে চলে, তাহলে সমাজে শ্রেণীবিদ্বেষ ও পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে না।

## উপসংহার

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবধর্মী একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। পৃথিবীতে মানুষ যাতে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট অনুগত বান্দা হিসেবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে সেরূপ পরিবেশ তৈরী করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গীকার। একটি সুষ্ঠু ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের পেছনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমাদের দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতির প্রবর্তন ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যকার পাহাড়সম বৈষম্য কমাতে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য আমাদের ইসলামী অর্থনীতির কৌশল প্রয়োগে সচেষ্ট হতে হবে। মানুষের মধ্যে ইসলাম এমন এক নৈতিকতা সৃষ্টি করেছে যেন তারা অপব্যয় না করে। অতিভোগ না করে। এই নৈতিক ছাকনীর মাধ্যমে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কেবল দুনিয়ার স্বার্থ দেখলে চলবে না, আখেরাতের স্বার্থও দেখতে হবে। অর্থব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এজন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও সরকারি নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

## References

1. আজাদ, মো: আবুল কালাম এবং ওয়ালীউল্লাহ, আবুল খায়ের মুহাম্মদ,"ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ", ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭.পৃ: ৪৪;
2. Mannan, M.A, (1970), Islamic Economic Theory and Practice, P, 13;
3. Ahmed, Khurshid, (1992), Nature and Significance of Islamic Economics, Jeddah, P, 99;
4. যায়াস, ফারিশতা, জ, দ, যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ-৭.
5. Ali, S, Amir, (1994), The Spirit of Islam, p, 257.
6. যায়াস, ফারিশতা, জ, দ, যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ-৮.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
একাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৩/নভেম্বর ২০০৬

# দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের অবস্থান ও মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা[১]

মোহাম্মদ রেজাউল করিম*

***Abstract***: *Among the four categories of employees i.e. Class I, Class II, Class III and Class IV second class officers are in the second position hierarchically with responsibilities to help the supervisor in administrative and financial matters. Sometimes they are drawing and disbursing officer and serve as the head of the respective office. Their role is very much vital in the area they work. However, being officer they are not well-paid according to their duties and responsibilities. Sometimes they are poorly paid in accordance with the other officers, even class three employee within the organization. This group is mostly dissatisfied group as they are very much deprived of good payment, timely promotion, suitable transfer, training facilities, managerial authority. This paper tries to analyse their present situation, find out reasons of dissatisfaction and grievances and show some potential suggestions and recommendations from the research findings.*

## ভূমিকা

চাকরি-জীবনে কর্মসন্তুষ্টি একটি প্রভাবশালী অনুষঙ্গ। দেশে বেকারত্বের হার ব্যাপক হওয়ায় চাকরি পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রত্যাশার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধায় কমতি দেখা দিলে অসন্তুষ্টি দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশি। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একজন কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পদোন্নতির জন্য রয়েছে সরকারি নীতিমালা। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় যথা কর্ম-পরিবেশ, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, চাকরির বর্তমান ও ভবিষ্যত আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি সকল কিছু বিধিমালায় বর্ণিত রয়েছে। চাকরি-জীবনে যখন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-ভেদে সুযোগ সুবিধার মধ্যে ব্যবধানটা খুব বেশি অযৌক্তিক হয়ে পড়ে, তখন শুরু হয় পারস্পরিক অসন্তোষ যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কাজের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বেলায় প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এই পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন যাদের অনেকেই অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যাদেরকে একটি মাত্র বেতন স্কেলে আবদ্ধ রেখে নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

---

১ আর্টিকেলটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের উপর পরিচালিত গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা।

* সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

## বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবী এবং অবস্থান

মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা আধা-সরকারি অফিসে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান। তাঁরা প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কাজের ধরন অনুযায়ী তাঁদের পদবীগুলোও বিচিত্র যা থেকে তাঁদের সঠিক অবস্থান বোঝা যায় না। নিম্নে একটি তালিকা (অংশ বিশেষ, যা মূলত আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উপর ভিত্তি করে তৈরী) উপস্থাপন করা হলো।

### টেবিল-১: দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবী ও অবস্থান

| | পদবী | মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর | কর্মস্থল |
|---|---|---|---|
| ১. | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | উপজেলা |
| ২. | উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | জেলা/উপজেলা |
| ৩. | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা/ প্রশিক্ষক | যুব ও ক্রীড়া অধিদপ্তর | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ৪. | জুনিয়র প্রশিক্ষক/টেকনিক্যাল সুপারভাইজার/বাজেট অফিসার/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বিভাগ |
| ৫. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | মন্ত্রণালয় | বিভাগ |
| ৬. | সহকারী আইন কর্মকর্তা | বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড | বিভাগ |
| ৭. | ওসি | স্বরাষ্ট | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ৮. | কানুনগো | ভূমি মন্ত্রণালয় | উপজেলা |
| ৯. | সহকারী শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১০. | সুপার | ডিভিশনাল কন্টোলার অব একাউন্টস | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১১. | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | পিডিবি-উডি/পিডিবি | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১২. | থানা আনসার ও ভিডিপি অফিসার | স্বরাষ্ট | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |

## পদবীগত অবস্থান

সামাজিক প্রত্যয়ের পরিবর্তন এবং সমাজের গতিশীলতার জন্য নানামুখী পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগে। গত আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে এবং নব্বইয়ের দশকে ব্যাপক প্রচারণা পেয়েছে দ্বিতীয় বা দুইকে নেতিবাচকরূপে প্রকাশ করার প্রবণতা। গুণগত মান যাই হোক না কেন দ্বিতীয় শব্দটিকে এক্ষেত্রে ইতিবাচকরূপে গ্রহণ করা হয় না। যেকোন কিছুতে সন্দেহ হলে তাকে দুই নম্বর বলা হয়। বর্ণিত কর্মকর্তাদের বেলায় এ বিষয়টি খুবই সত্য। দ্বিতীয় শব্দটি নেতিবাচকরূপে প্রকাশের একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের

## বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবী এবং অবস্থান

মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা আধা-সরকারি অফিসে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান। তাঁরা প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কাজের ধরন অনুযায়ী তাঁদের পদবীগুলোও বিচিত্র যা থেকে তাঁদের সঠিক অবস্থান বোঝা যায় না। নিম্নে একটি তালিকা (অংশ বিশেষ, যা মূলত আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উপর ভিত্তি করে তৈরী) উপস্থাপন করা হলো।

### টেবিল-১: দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবী ও অবস্থান

| | পদবী | মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর | কর্মস্থল |
|---|---|---|---|
| ১. | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | উপজেলা |
| ২. | উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | জেলা/উপজেলা |
| ৩. | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা/ প্রশিক্ষক | যুব ও ক্রীড়া অধিদপ্তর | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ৪. | জুনিয়র প্রশিক্ষক/টেকনিক্যাল সুপারভাইজার/বাজেট অফিসার/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বিভাগ |
| ৫. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | মন্ত্রণালয় | বিভাগ |
| ৬. | সহকারী আইন কর্মকর্তা | বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড | বিভাগ |
| ৭. | ওসি | স্বরাষ্ট্র | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ৮. | কানুনগো | ভূমি মন্ত্রণালয় | উপজেলা |
| ৯. | সহকারী শিক্ষক (মাধ্যামিক বিদ্যালয়) | মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১০. | সুপার | ডিভিশনাল কন্টোলার অব একাউন্টস | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১১. | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | পিডবি-উডি/পিডিবি | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |
| ১২. | থানা আনসার ও ভিডিপি অফিসার | স্বরাষ্ট্র | উপজেলা/জেলা/বিভাগ |

### পদবীগত অবস্থান

সামাজিক প্রত্যয়ের পরিবর্তন এবং সমাজের গতিশীলতার জন্য নানামুখী পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগে। গত আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে এবং নব্বইয়ের দশকে ব্যাপক প্রচারণা পেয়েছে দ্বিতীয় বা দুইকে নেতিবাচকরূপে প্রকাশ করার প্রবণতা। গুণগত মান যাই হোক না কেন দ্বিতীয় শব্দটিকে এক্ষেত্রে ইতিবাচকরূপে গ্রহণ করা হয় না। যেকোন কিছুতে সন্দেহ হলে তাকে দুই নম্বর বলা হয়। বর্ণিত কর্মকর্তাদের বেলায় এ বিষয়টি খুবই সত্য। দ্বিতীয় শব্দটি নেতিবাচকরূপে প্রকাশের একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের

সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে তাদের হতাশার চিত্র আরও তীব্র বলে জানা গেছে। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

## সুযোগ-সুবিধাদি

বর্ণিত এসব কর্মকর্তাবৃন্দ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেতন-বৈষম্যসহ চাকরিক্ষেত্রে নানাবিধ বৈষম্যের শিকার। আর্থিক ও অনার্থিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন কোন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী অপেক্ষা কম পেয়ে থাকেন।

## বেতন-ভাতাদি

বাংলাদেশের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং সঙ্গতি রেখে বেতন স্কেল প্রদানের দাবি দীর্ঘ দিনের। এ দাবি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের আরও বেশি। বেতন স্কেলে মোট ২০ (বিশ)টি গ্রেড রয়েছে, যার মধ্যে একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের। ১৯৯১ সনের বেতন স্কেলে তাদের জন্য তিনটি গ্রেড (দ্বাদশ, একাদশ ও দশম) রাখার বিধান করা হলেও এখন আর নেই। বর্তমানে দশম গ্রেডটিতে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। তবে কোন কোন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান একাদশ গ্রেডেও নিয়োগ দিয়ে থাকে যা সাধারণত তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য। অথচ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য ৯টি এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ৮টি গ্রেড রয়েছে। এমন কি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ২টি গ্রেড রয়েছে। বিপিএটিসিসহ কোন কোন প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যদিও সেরকম সুযোগ খুবই অল্প প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি মাত্র পদে ব্লক পোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় অথবা তৃতীয় শ্রেণি থেকে পদোন্নতি দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্লক পোস্ট বলে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ একটি মাত্র বেতন গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে একই গ্রেডে অবস্থান করেন। তবে যদি কোন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীগণ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী থাকা অবস্থায় সিলেক্শন গ্রেডের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডে বেতন পেয়ে থাকেন তিনি দ্বিতীয় কর্মকর্তার পদে নির্দিষ্ট গ্রেড (পে-স্কেলের নবম গ্রেড) অপেক্ষা উচ্চতর গ্রেডে বেতন অর্থাৎ নবম গ্রেড বা অষ্টম গ্রেড পেতে পারেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী অবস্থায় প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে ধারাবাহিকভাবে সেইসব আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আবার অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণির পদে টাইমস্কেল এবং সিলেকশন গ্রেডের সুযোগ থাকার জন্য পে-স্কেলে দশম গ্রেড নিয়োগ প্রাপ্ত একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী পদোন্নতি না পেয়ে সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে

কর্মরত কর্মকর্তার চেয়ে বেশি উচ্চতর গ্রেড এবং বেশি বেতন পেতে পারেন। একটি অফিসের একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী এবং দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার মধ্যে বেতন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা অপেক্ষা বেশি পেয়ে থাকেন যদিও তিনি পরে চাকরীতে যোগদান করেছেন (টেবিল ৩) আবার বেতন কাঠামোতে তাদের জন্য একটি মাত্র গ্রেড নির্ধারিত থাকাতে সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছার সুযোগ নেই কারণ একটি গ্রেডের সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছতে ১৮ বছর সময় লাগে (বাংলাদেশ সরকার, পে-স্কেল- ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৫)। প্রতি পাঁচ বছর পর পর বেতন স্কেল ঘোষণা এবং কার্যকর করার বিধান থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৮ বছর লেগে যায়। পে-স্কেলে ৫ থেকে ৮টি ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার পর নতুন বেতন স্কেলে একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বেতন নতুন পে-স্কেল অনুসারে বেতন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার ফলে সাধারণত নবীনতম কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি লাভবান হয়ে থাকেন।

সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে প্রতি নতুন স্কেলে ৫০% বা তার বেশি বেতন বর্ধিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সনের বেতন স্কেলে পূর্ববর্তী বেতন স্কেলের তুলনায় গড়ে ৭০.৯৮% বাড়লেও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য বেড়েছিল ৭০% এবং ১৯৯৭ সনের বেতন স্কেলে পূর্ববর্তী বেতন স্কেলের তুলনায় গড়ে ৫২.৫৮% বাড়লেও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য বেড়েছিল ৪৭.৪৩%। আবার সর্বশেষ ২০০৫ সনের বেতন স্কেলে গড়ে ৫৪.১১% বাড়ে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বাড়ে ৫০%। লক্ষণীয়, ১৯৯১ সনের তুলনায় পরবর্তী সময়ে ঘোষিত বেতন স্কেলে বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নগামী। প্রতি ক্ষেত্রেই ১০ম স্কেলটিতে বৃদ্ধির হার খুব কম (টেবিল-২)। বেতন বৃদ্ধির দিক থেকে ১০ম গ্রেডের অবস্থান ১৯৯১ সনে ১৫শ, ১৯৯৭ সনে ১৪শ এবং ২০০৫ সনে ১৫শ (বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি ১,২,৩)।

**টেবিল-২: তুলনামুলক বেতন বৃদ্ধির হার (১৯৯১, ১৯৯৭ এবং ২০০৫)।**

| বেতন গ্রেড | ১৯৮৫ সনের তুলনায় ১৯৯১ বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান | ১৯৯১ সনের তুলনায় ১৯৯৭ বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান | ১৯৯৭ সনের তুলনায় ২০০৫ বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬৬.৬৭ | ১৮শ | ৫০.০০ | ১৩শ | ৫৩.৩৩ | ১৩শ |
| ২ | ৫০.৮৮ | ২০শ | ৫০.০০ | ১৩শ | ৪৯.৬১ | ১৬শ |
| ৩ | ৬৪.২১ | ১৯শ | ৫০.০০ | ১৩শ | ৪৩.৫৯ | ১৯শ |
| ৪ | ৬৯.০৫ | ১৭শ | ৫০.৭০ | ১২শ | ৪০.১৯ | ২০শ |
| ৫ | ৭০.২৭ | ১৬শ | ৫০.৭৯ | ১১শ | ৪৪.৭৪ | ১৮শ |
| ৬ | ৭১.৪৩ | ১২শ | ৫০.০০ | ১৩শ | ৫২.৭৮ | ১৪শ |
| ৭ | ৭০.৮৩ | ১৪শ | ৫০.০০ | ১৩শ | ৪৬.৩৪ | ১৭শ |
| ৮ | ৭২.৯৭ | ৭ম | ৫০.০০ | ১৩শ | ৫৪.১৭ | ১২শ |
| ৯ | ৭২.৭৩ | ৮ম | ৫০.৮৮ | ১০ম | ৫৮.১৪ | ৭ম |
| **১০** | ***৭০.৩৭*** | ***১৫শ*** | ***৪৭.৮৩*** | ***১৪শ*** | ***৫০.০০*** | ***১৫শ*** |
| ১১ | ৭২.৫০ | ৯ম | ৪৭.৮৩ | ১৪শ | ৬০.৭৮ | ২য় |
| ১২ | ৭২.২২ | ১০ম | ৫৩.২৩ | ৬ষ্ঠ | ৫৫.৭৯ | ১০ম |
| ১৩ | ৭৩.৫৩ | ৪র্থ | ৫২.৫৪ | ৮ম | ৫৫.৫৬ | ১১শ |
| ১৪ | ৭১.৮৮ | ১১শ | ৫২.৭৩ | ৭ম | ৫৭.১৪ | ৮ম |
| ১৫ | ৭৩.৩৩ | ৫ম | ৫১.৯২ | ৯ম | ৫৬.৯৬ | ৯ম |
| ১৬ | ৭১.৪৩ | ১৩শ | ৫৬.২৫ | ৩য় | ৬০.০০ | ৪র্থ |
| ১৭ | ৭৩.০৮ | ৬ষ্ঠ | ৫৫.৫৬ | ৪র্থ | ৬২.৮৬ | ১ম |
| ১৮ | ৭৫.০০ | ৩য় | ৫৪.৭৬ | ৫ম | ৬০.০০ | ৫ম |
| ১৯ | ৭৭.২৭ | ২য় | ৬০.০০ | ২য় | ৬০.২৬ | ৩য় |
| ২০ | ৮০.০০ | ১ম | ৬৬.৬৭ | ১ম | ৬০.০০ | ৬ষ্ঠ |

একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময় পর শুধুমাত্র ইনক্রিমেন্ট পেয়ে একই স্কেলে নির্ধারিত বেতন পেয়ে থাকেন। ২০০১ বা পূর্ববর্তী সময়ে ঘোষিত বেতন স্কেল অনুযায়ী ৬ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য ৩টি, ৩ বছর বা ৬ বছরের কম হলে ২টি এবং ৩ বছরের কম হলে ১টি ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে বেতন নির্ধারণ করার বিধান প্রচলিত ছিল। ফলে, অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের আর্থিক লাভবান হওয়ার সুযোগ বেশি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যকার বেতন বৃদ্ধির হার খুব বেশি ছিল না। তবে সর্বশেষ ২০০৫ সনের বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা অনেকটা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয় (বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫)।

তৃতীয় শ্রেণির একজন কর্মচারীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বেতন বৈষম্য প্রকট। একই সময়ে যোগদানকারী একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী পর্যায়ক্রমে সিলেকশন গ্রেড পেয়ে নবম (৬৮০০-১৩০৯০) বা অষ্টম গ্রেড (৭৪০০-১৩২৪০) বেতন স্কেল পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে যারা একাদশ স্কেলে চাকরিতে যোগদান করেন তিনি ১৫বছর পর ৮ম গ্রেডে বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হন। পরবর্তীতে নতুন বেতন স্কেলের সময় একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার

চেয়ে বেশি বেতন পেয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির সুযোগ কম বিধায় সরাসরি যোগদানকারী একজন কর্মকর্তা একই বেতন স্কেলে (ইনক্রিমিন্টেসহ) সব সময় বেতন পেয়ে থাকেন।

## সিলেকশন গ্রেড

বিসিএস-এ নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ চাকরির চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত পদের অর্ধেক প্রথম সিলেকশন গ্রেড (নবম থেকে সপ্তম গ্রেড) পান এবং দশ বছর চাকরির পর সকল কর্মকর্তা পঞ্চম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হন (বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫)। বিসিএস বহির্ভূত অন্যান্য প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চার বছর সন্তোষজনক চাকরির পর নির্ধারিত পদের অর্ধেক র্ককর্তা সিলেকশন গ্রেড পেয়ে উচ্চতর বেতন স্কেলে উন্নীত হন এবং বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। কিন্তু একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার সমগ্র চাকরি জীবনে ২০০৫ সনের পূর্বে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার বিধান ছিল না। ২০০৫ সনে কোন অফিসে কর্মরত স্থায়ী পদের অর্ধেক কর্মকর্তার সিলেকশন গ্রেড প্রাধিকারের বিধান রয়েছে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫)। যেহেতু ২০০৫ সনের পূর্বে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার বিধান ছিল না, কর্মকর্তাদের আজীবন একই বেতন স্কেলে চাকরি করতে হতো অথবা পরবর্তীতে নতুন পেস্কেল ঘোষণার জন্য সরকারের কৃপা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। বর্তমান নিয়মানুযায়ী কোন অফিসে মোট বরাদ্দকৃত পদের অর্ধেক কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড দেওয়ার বিধান রয়েছে, ফলে বাকী অর্ধেক কর্মকর্তাকে চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময় একই বেতন স্কেলে ১০ম গ্রেডে আবদ্ধ থাকতে হবে। অথবা সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তার পদোন্নতি বা অবসরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা বিশেষ করে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ চাকরির ৪ বছর ৭ম গ্রেডে, ১০ বছর পর ৫ম গ্রেডে এবং ২০ বছর পর সিলেকশন পেয়ে বর্ধিত বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন (মিয়া, ১৯৯৯; মিয়া, ২০০২)।

## টাইমস্কেল

একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী চাকরি জীবনে তিনটি টাইমস্কেল পান। প্রথম টাইম স্কেল পান চাকরির ৮ বছর পর, দ্বিতীয়টি ১২ বছর পর এবং তৃতীয়টি ১৫বছর পর। ১৫ বছরে তিনি সাধারণ নিয়মে তিনটি উচ্চতর বেতন স্কেল প্রাপ্ত হন। ফলে তিনবার তাঁর বেতন স্কেল পুনঃনির্ধারিত হয়। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পক্ষে চাকরি জীবনে কখনও টাইমস্কেল পাওয়া সম্ভব নয়। চাকরি (বেতনভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর ৭(২) এ বর্ণিত আছে "দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাগণ, তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট পদের বেতনস্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার ১ বৎসর পর এবং তাঁহাদের চাকরির

সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হইবেন, তবে পদোন্নতি ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ১টির বেশি উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না।" দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বেশির ভাগের সর্বোচ্চ ধাপে পৌছানোর সুযোগ নেই। যেহেতু একটি মাত্র স্কেল তাদের এবং ৫-৮ বছর পর নুতন স্কেল ঘোষণার ফলে প্রতি বেতন স্কেলের পর নতুনভাবে বেতন নির্ধারিত হয়ে থাকে। বেশির ভাগ (৯০%) কর্মকর্তা তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের মত তাদের ও টাইমস্কেল থাকা উচিত বলে মনে করেন (তথ্যপঞ্জি, চিত্র-১৩)। অনেকেই মনে করেন সমগ্র চাকরি জীবনে অন্তত ২টি টাইমস্কেল থাকা উচিত (তথ্যপঞ্জি, চিত্র-১৪)। এই বেতন বৈষম্যের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর মধ্যে বেতনভাতাদির প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

**টেবিল-৩: একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর মধ্যকার বেতন প্রাপ্তির তুলনামূলক চিত্র।**

| | কর্মকর্তা | | কর্মচারী | |
|---|---|---|---|---|
| | বেতন | গ্রেড | বেতন | গ্রেড |
| ০১/১/৮৮[১] | ১০০০.০০ | ১০ম | - | - |
| ২২/০১/৮৯[২] | ১০৭০.০০ | ১০ম | ৯০০.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯০ | ১১৪০.০০ | ১০ম | ৯৬৫.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯১ | ১২৮০.০০ | ১০ম | ১০৩০.০০ | ১২শ |
| জুলাই ১, ১৯৯১ | ১৯৩৫.০০ | ১০ম | ১০৬৫.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯২ | ২০৪০.০০ | ১০ম | ১৭৫০.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯৪ | ২৩০০.০০ | ১০ম | ১৮৫০.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯৫ | ২৪১৫.০০ | ১০ম | ২০৫০.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯৬ | ২৬৪৫.০০ | ১০ম | ২২৫০.০০ | ১২শ |
| ০১/০১/৯৭ | ২৯৯০.০০ | ১০ম | ২৩৫৫.০০ | ১১শ |
| জুলাই ১, ১৯৯৭ | ৩১০৫.০০ | ১০ম | ২৮৩৯.০০ | ১১শ |
| ০১/০১/৯৮ | ৩৫৮৮.০০ | ১০ম | ৩১৭০.০০ | ১১শ |
| ০১/০১/৯৯ | ৪০৮০.০০ | ১০ম | ৩৩২৫.০০ | ১১শ |
| ০১/০১/২০০০ | ৪২৫০.০০ | ১০ম | ৩৪৮০.০০ | ১১শ |
| ০১/০১/০১ | ৪৪২০.০০ | ১০ম | ৩৯১০.০০ | ১০ম |
| ০১/০১/০২ | ৪৫৯০.০০ | ১০ম | ৪০৮০.০০ | ১০ম |
| ০১/০১/০৩ | ৪৭৭৫.০০ | ১০ম | ৪২৫০.০০ | ১০ম |
| ০১/০১/০৪ | ৪৯৬০.০০ | ১০ম | ৪৪২০.০০ | ১০ম |
| ০১/০১/০৫ | ৫১৪৫ | ১০ম | ৪৫৯০.০০ | ১০ম |
| ০১/০৭/০৬ | ৭৩৪০ | ১০ম | ৮৪২৫ | ১০ম |
| ৮ বছর পর প্রথম সিলেকশন গ্রেড ২২/০১/৯৭ | - | ১০ম | ২৩৫৫.০০ | ১১শ |
| ১২ বছর পর প্রথম সিলেকশন গ্রেড ২২/০১/২০০১ | - | ১০ম | ৩৯১০.০০ | ১০ম |
| ১৫ বছর পর প্রথম সিলেকশন গ্রেড ২২/০১/২০০৪ | - | ১০ম | ৪৪২০.০০ | ১০ম |

(আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রামে কর্মরত টেকনিক্যাল সুপারভাইজার (দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা) এবং প্রশিক্ষণ সহকারী (তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী) এর তুলনামূলক বেতন বিবরণী)

[১] দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকতার চাকরিতে প্রথম যোগদান

[২] একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর চাকরিতে প্রথম যোগদান

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী টাইম স্কেল পাওয়ার দরুন একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার সাথে বা পরে যোগদান করে পনের বছর পর বর্ণিত কর্মকর্তা অপেক্ষা উচ্চতর বেতন ভাতাদি পান। প্রায় প্রতিটি সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এ রকম নজির রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন কর্মচারী একাদশ বা দ্বাদশ স্কেলে যোগদান করেও উচ্চতর গ্রেড অর্থাৎ নবম বা অষ্টম গ্রেডে বেতন পেতে পারেন। যদি একাদশ স্কেলে যোগদান করে থাকেন তবে তিনি বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা অপেক্ষা ২ বা ৩ ধাপ উপরে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। একজন কর্মকর্তা আগে যোগদান করেও একজন কর্মচারী অপেক্ষা বেতন কম পেয়ে থাকেন। বিষয়টি কেবল অযৌক্তিকই নয় কষ্টদায়কও বটে। গবেষণার ফলাফলেও লক্ষ্য করা গেছে যে, বেশির ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা যারা তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী অপেক্ষা বেতন ভাতাদি কম পাচ্ছেন যাদের মধ্যে নতুন যোগদানকারী ছাড়াও কিছু কর্মকর্তা (১০ জন) রয়েছেন যারা কর্মচারীদের সাথে বা আগে যোগদান করেও কম বেতনাদি পাচ্ছেন। বিশেষত কর্মচারী হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ যেসব আর্থিক ভাতাদি পেয়ে থাকেন কর্মকর্তা হওয়ার কারণে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ সে সব সুবিধা প্রাপ্ত হন না। ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয় যা তার কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

## পদোন্নতি

সরকারি চাকরিতে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির গতি তুলনামূলক সচল। অন্যান্য নন-গেজেটেড এবং কিছু প্রফেশনাল ক্যাডারে পদোন্নতির গতি খুবই ধীর। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য পদোন্নতির সুযোগ নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পদ ব্লক পোস্ট বলে চাকরির শুরু ও শেষ একই পদে। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যক্তি অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদোন্নতির সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না; বিষয়টি কষ্টদায়ক হলেও এ নির্মম বিষয় নিয়ে প্রায়শই হাস্য-রসিকতা করতে শোনা যায়। আবার প্রথম শ্রেণির অধিকাংশ পদে সরাসরি নিয়োগ হয় বলে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কোন কোন ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পদোন্নতির সময়সীমা বর্তমান চাকরিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বছর হলেও কেউ প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে একই পদে অবস্থান করছেন। আবার বেশির ভাগ কর্মকর্তা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সমগ্র চাকরি জীবনে আদৌ পদোন্নতি পাবেন কিনা যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে অনেকেই সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী (তথ্যপঞ্জি, চিত্র-১৫, ১৮)। বিশেষত সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ (৫৭%) আদৌ পদোন্নতি পাবেন কিনা বা কবে পাবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন (তথ্যপঞ্জি, চিত্র ১৬, ১৮)।

### টেবিল-৪: একই পদে চাকরির মেয়াদ

| চাকরি মেয়াদ | মূল্যায়নকারীর শতকরা হার |
|---|---|
| ০-৫ বছর | ৪০ |
| ৫-৯ বছর | ১০ |
| ১০-১৪ বছর | ৩০ |
| ১৫-১৯ বছর | ৭ |
| ২০-২৪ বছর | ৩ |
| ২৫ বা তার বেশি | ১০ |

নীতিমালা করার ক্ষেত্রে সার্বিক বিষয়গুলো পুঙখানুপুঙখভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। পাশাপাশি নীতিমালা প্রণয়নের সার্থকতা নির্ভর করে এর সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উপর। চাকরি পাওয়া কঠিন বটে; চাকরি পাওয়ার পর সহজাত প্রক্রিয়া হচেছ যৌক্তিক বেতনভাতা এবং সময়মত পদোন্নতি। চাকরিতে যোগদানের ফলে বায়োলজিকাল নীডগুলোর পূর্ণতা ঘটে; পাশাপাশি অন্যান্য নীডগুলোর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে এবং প্রাপ্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে (Maslow, ১৯৭০)। চাকরিতে পদোন্নতিসহ আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা আনয়ন জরুরি।

### বদলী

বদলী নেতিবাচক বা ইতিবাচক উভয়ই হতে পারে। বদলীর ক্ষেত্রে যে সব বিবেচ্য বিষয় তা হলো একই অবস্থানে তিন বছর বা অধিক সময় চাকরি, পদোন্নতি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা আবার কখনও ঊর্ধ্বতন বা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার ইচ্ছা। তবে বদলীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কর্মকর্তা যখন একই পদে দীর্ঘদিন কাজ করেন সে পদের কর্মকাণ্ডে একঘেয়েমি ভাব চলে আসে, সে একঘেয়েমি দূর করা। এর ফলে প্রত্যাশিত স্থানে বদলী হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানসিক সান্ত্বনা পান যা তাঁর কাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, আরও অধিক গতিশীলতার সাথে কাজ করতে প্রণোদনা যোগায়। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ এক্ষেত্রেও বঞ্চনার শিকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদে কর্মকর্তার সংখ্যা কম বলে বদলীটা প্রায়শই হয়ে উঠে না। আবার বিভাগীয় বা বড় বড় অফিসগুলোতে এ পদের কর্মকর্তা থাকে না বা কম থাকেন বলে তাদেরকে বদলী করা হয়ে উঠে না। ফলে কোন কোন কর্মকর্তাকে সমগ্র চাকরি জীবন একই কর্মস্থলে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলী হলে কর্মকর্তাদের কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ

হলে কাজের মাত্রা ও ধরন পরিবর্তিত হয়। ভিন্নধর্মী কাজের পরিবেশ এবং কাজ ব্যক্তির মধ্যে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

বদলীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রায়শই দেখা যায় তা হলো, কোন ব্যক্তি একটি ভালো অবস্থান (কর্ম পরিবেশ, বিভাগীয় সদর, রাজধানী) বা পজিশনে কাজ করে থাকেন তিনি আর পরিবর্তন করতে চান না। যেকোন প্রকারে সেখানেই অবস্থান করতে চান। ফলে দীর্ঘমেয়াদী জ্যামের তৈরী হয়। যেমন, একজন কর্মকর্তা ঢাকায় কর্মরত। তিনি যেকোন কৌশলে সে পদটি ধরে রাখতে চান। এদিকে একই পর্যায়ের কর্মকর্তার সংখ্যা কম থাকায় ঢাকার সুযোগটি একই ব্যক্তির দখলে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। পাশাপাশি পেরিফেরিতে অবস্থান করার দরুন নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন অনেকে, যার ফলে তাদের মধ্যে দক্ষতার অভাব দেখা যায় । আবার বদলী সংক্রান্ত নীতিমালায় দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের একই বিভাগে বদলী করার কথা হলেও পদ সংখ্যা কম হওয়ার দরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা সম্ভব হয় না (মিয়া, ২০০২)। বদলী বিষয়ে সরকারি নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ করা হলে, এতে অবৈধ হস্তক্ষেপ, স্বজনপ্রীতি কিংবা প্রিয়তোষণ কমে আসবে।

## কর্ম পরিবেশ

অফিসে সাধারণভাবে কর্ম সম্পদান করার জন্য সহায়ক সকল সুবিধাদি প্রাপ্তি এবং অধস্তন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের পরিবেশ তৈরী খুবই জরুরি। পদসোপানগত অবস্থান ভালো না হলে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কার্যক্রম উভয়ই সঠিকভাবে সম্পাদন করা হয় না। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বাবধান শব্দটি মোড়লীপনার পরিবর্তে সহযোগিতা অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখনও অফিসগুলোতে ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ যা কর্ম-পরিবেশকে জটিল করে তুলছে এবং কাজের স্বাভাবিক গতিশীলতাকে ধীর করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও প্রকট কারণ তারা একই অবস্থানে থাকেন বলে বার বার নতুন নতুন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নানামুখী সিদ্ধান্তের টানাপোড়নে কাজ করে থাকেন। নিয়মতান্ত্রিক জটিলতা, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, বাহ্যিক অনুঘটকের অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবৈধ হস্তক্ষেপ, নতুন পুরাতন দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানাবিধ পরিবর্তনশীল চলক অফিসের কাজের পরিবেশকে নেতিবাচক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানষিক দূরত্ব বাড়ছে, কাজের প্রতি অনীতা সৃষ্টি হচ্ছে; জনসাধারণ কাজ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

## অন্যান্য সুবিধাদি

প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা, তারপর সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা (Maslow, ১৯৭০)। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের প্রাপ্ত বেতন দিয়ে এ চাহিদাগুলো পূরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালান। আর্থিক ও অনার্থিক সকল প্রকার সুযোগই তাদের জন্য অপর্যাপ্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ।প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় বেশির ভাগ কর্মকর্তা সকল বিষয়ে তাঁদেরকে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের সাথে তুলনা করে থাকেন এবং যাদের থেকে তাঁরা সকল ক্ষেত্রে কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

## আর্থিক সুবিধা

একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা কোন প্রকার যাতায়াত ভাতা পান না যা তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীগণ পেয়ে থাকেন। আবার দাপ্তরিক কাজের জন্য কর্মস্থলের পাঁচ মাইলের মধ্যে হলে রিক্সা বা ট্যাক্সি ব্যবহার করলেও সে ভাড়া বা যাতায়াত ভাতা দাবি করতে পারেন না। প্রতি মাসে তাদেরকে যৌথবীমা তহবিলে ০.০৭% বা সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে, একজন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পক্ষে সরকার প্রদান করে বলে তাদেরকে প্রদান করতে হয় না। যৌথবীমা বাবদ চাকরি জীবনে (কমপক্ষে ২৫বছর) ন্যূনতম ৯০০০ টাকা প্রদান করতে হয়। কর্মকর্তা হওয়ার দরুন তিনি টিফিন ভাতা পান না যার পরিমাণ কমপক্ষে ৩০০০০ টাকা। ফলে, একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কর্মকর্তার সমান বা উচ্চ স্কেলে বেতন পেয়েও তিনি মোট ৫৪০০০ টাকা অতিরিক্ত পাচ্ছেন, যা একজন কর্মকর্তা পাচ্ছেন না (টেবিল-৫)।

**টেবিল-৫: একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর তুলনায় একজন কর্মকর্তা যে পরিমাণ কম পাচ্ছেন ।**

| | প্রতিমাসে | প্রতি বছরে | ২৫ বছরে | মোট |
|---|---|---|---|---|
| যৌথবীমা | ৪০ | ৪৮০ | ১২০০০ | ৬৬০০০টাকা |
| টিফিন ভাতা | ১০০ | ১২০০ | ৩০০০০ | |
| যাতায়াত ভাতা | ৮০ | ৯৬০ | ২৪০০০ | |

## অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভাতাদি

পদবীটি কেবল কর্মকর্তা হওয়ায় অফিসের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার জন্য একজন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর মত তিনি কোন ভাতা পান না। যদিও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সাধারণ নিয়মানুযায়ী মূল বেতনের ৫% ভাতা পেয়ে থাকেন (বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫)।

## যানবাহন সুবিধা

যদিও সার্বক্ষণিক যানবাহন সুবিধা পাওয়ার প্রাধিকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার নেই তবে অফিস প্রধান হিসেবে গাড়ি সুবিধা থাকলে কিংবা অফিসিয়ালি সবার জন্য বাসা-অফিস যোগাযোগের জন্য গাড়ি সুবিধা থাকলে এ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্ম-অসন্তুষ্টি অনেকাংশে লাঘব হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর বা রাজধানীর সাথে যোগাযোগের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে যা তাদের দৈনন্দিন কেনাকাটা বা অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় কমাতে পারে যা তার মূল বেতনের উপর প্রভাব ফেলবে না।

## প্রশিক্ষণ

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। অথচ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোতে বিষয়টি খুবই অবহেলিত। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বেলায় কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। অধিকাংশ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু তাদের সংখ্যা কম হওয়ায় তাদেরকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়তে চান না। ফলে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ কমে যায়। কেউ কেউ সমগ্র চাকরি জীবনে একবার মাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আবার কেউ দীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রথম প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (তথ্যপঞ্জি ১৮)। যে কর্মকর্তা সমগ্র চাকরি জীবনে একবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন বা ২৩ বছরে মাত্র একবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি চাকরির শুরুতে প্রশিক্ষণ পেলে অবশ্যই সরকারকে আরও ভালো কাজ উপহার দিতে পারতেন, জনসাধারণকে আরও উত্তম সেবা প্রদান করতে পারতেন। আরও অধিক গতিশীল, কার্যকরভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারতেন। আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতি বছর ২টি বা ৩টি মাত্র কোর্স তাদের জন্য আয়োজন করে থাকেন (প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২০০৪-২০০৫)। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ অফিসগুলোতে প্রশাসনিক ও আর্থিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন যা তাঁরা প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিধিমালা পড়ে নিজস্ব বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে ভুলের পরিমাণও বেশি হয়। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই অফিস প্রধান হিসেবে কতটুকু কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

## সামাজিক মর্যাদা

মর্যাদার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা, তারপর স্বচ্ছলতা। একজন কর্মচারী অপেক্ষা যখন নিম্নস্কেলে একজন কর্মকর্তা (একই সাথে যোগদান করেও) বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন, তখন তাদের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক যার বহিঃপ্রকাশ সমাজে পড়বে। সমাজও তাকে অবমূল্যায়ন করে। আবার নিয়ম নীতির ফলে কখনও কর্মচারী থেকে কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেলে তাদের আর্থিক সুবিধা কমে যায়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও এমন ধারণার প্রচলন আছে যে, অর্থই হচ্ছে মর্যাদা প্রকাশের একমাত্র বিষয়। চাকরির বয়স বাড়ার সাথে সাথে অর্থের চাহিদাও বাড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের গতি ধীর। যে জন্য তাঁরা পরিবর্তিত পরিবেশে সামাজিক, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সব সময়ই নিজেদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এ পদে কর্মরত কর্মকর্তাগণ অনেকেই একে অভিশপ্ত পদ মনে করেন। সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার দিক থেকে শুধুমাত্র কর্মকর্তা শব্দের আড়ালে তাদেরকে প্রতিবন্ধী করে রাখা হয়েছে। সেজন্য তাদের অনেকেই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন।

## সুপারিশ

বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, চাকরি সন্তুষ্টি অর্জন এবং জনগণকে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

১. নতুন বেতন স্কেলের সময় দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে প্রচলিত পে-স্কেলের বিশটি ধাপের মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য নয়টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য একটি, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আটটি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য দুইটি ধাপ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের একাধিক বেতন গ্রেডের বিধান রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের মত আট বছর পর প্রথম, বার বছর দ্বিতীয় এবং পনের বছর পর তৃতীয় টাইমস্কেলের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

২. চাকরির মেয়াদ একই হলে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা যেন কোনক্রমেই তার অধস্তন অপেক্ষা কম বেতন না পান বা নিম্নস্কেলে বেতন

না পান তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কনিষ্ট জন অপেক্ষা বেতন কম পেলে বেতন পুনঃনির্ধারণ পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে কর্মচারী কর্মকর্তাভেদে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা তাঁর অফিসের কোন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী (সমসাময়িক) তাঁর অপেক্ষা বেতন বেশি পেলে কর্মকর্তার বেতন কর্মচারীর বেতনের পরবর্তীতে ধাপে উন্নীত করা যেতে পারে।

৩. দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদ বিলোপ সাধন করে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে তাদের গ্রেড প্রয়োজনবোধে সর্বনিম্নস্তরে রাখা যেতে পারে; সেক্ষেত্রে তারা প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদের কর্মকর্তাদের মত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।

৪. একই পদে কমপক্ষে বিশ বছর চাকরি করলে বিশেষ পদোন্নতিসহ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা।

৫. এ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সবার প্রতি সুবিচার নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারের বদলী সংক্রান্ত নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে সময়ে সময়ে পছন্দমত কর্মক্ষেত্রে বদলী করা যেতে পারে।

৬. প্রত্যাশিত অবস্থান থেকে সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানে বদলী । অর্থাৎ বাড়ি থেকে কাছাকাছি কোন পদায়নের সুযোগ প্রদান অথবা অফিস কম্পাউন্ডে আবাসনের ব্যবস্থা করা।

## উপসংহার

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ আর্থিক সুবিধাদি অর্থাৎ বেতন ভাতাদি, সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অন্যদিকে, একই পদে দীর্ঘদিন পদোন্নতি ছাড়াও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রণোদনামূলক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। কর্মকর্তা হয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী অপেক্ষা বেতন ভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা কম পান। ইত্যাদি বিষয় তাঁদের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও হতাশা তৈরী করে যা কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাঁদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রণোদনামূলক চাহিদাগুলো পূরণ করা না হলে তাঁরা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন, কাজের গতিশীলতা কমবে, উৎপাদনশীলতা কমে আসবে (Brook,১৯৯৯)। এ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক তাদের ক্ষোভ ও হতাশা নিরসনে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে সার্বিকভাবে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।

## তথ্যপঞ্জি


১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯১), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১, ঢাকা: সরকারি প্রকাশনা

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯৭, ঢাকা: সরকারি প্রকাশনা

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৫), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, ঢাকা: সরকারি প্রকাশনা

৪. Brooks, I. (1999) Organisational Behavour: Individuals, Groups an dthe Orgnisation, London: Financial Times Pitman Publishing.

৫. মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, (১৯৯৯) নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির বিধিমালা (সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), ঢাকা: নিউ ওয়ার্শী বুক কর্পোরেশন।

৬. মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, (২০০০) চাকরির বিধিমালা, ঢাকা: ঢাকা ল বুক হাউস।

৭. মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ (২০০২) চাকরির বিধানাবলী, ঢাকা:রোদ্দুর প্রকাশনী।

৮. Maslow, A. H. (1970) Motivation and Personality, New York and London: Harper & Row Publishers.

৯. প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি, ২০০৪-২০০৫ (আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার জন্য), ঢাকা: বিপিএটিসি প্রকাশনা

## ১০. ১৯৮৫ সনের তুলনায় ১৯৯১ -এ বেতন বৃদ্ধির হার

| বেতন গ্রেড | ১৯৮৫ | ১৯৯১ | বেতন বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬০০০ | ১০০০০ | ৬৬.৬৭ | ১৮শ |
| ২ | ৫৭০০ | ৮৬০০ | ৫০.৮৮ | ২০শ |
| ৩ | ৪৭৫০ | ৭৮০০ | ৬৪.২১ | ১৯শ |
| ৪ | ৪২০০ | ৭১০০ | ৬৯.০৫ | ১৭শ |
| ৫ | ৩৭০০ | ৬৩০০ | ৭০.২৭ | ১৬শ |
| ৬ | ২৮০০ | ৪৮০০ | ৭১.৪৩ | ১২শ |
| ৭ | ২৪০০ | ৪১০০ | ৭০.৮৩ | ১৪শ |
| ৮ | ১৮৫০ | ৩২০০ | ৭২.৯৭ | ৭ম |
| ৯ | ১৬৫০ | ২৮৫০ | ৭২.৭৩ | ৮ম |
| ১০ | ১৩৫০ | ২৩০০ | ৭০.৩৭ | ১৫শ |
| ১১ | ১০০০ | ১৭২৫ | ৭২.৫০ | ৯ম |
| ১২ | ৯০০ | ১৫৫০ | ৭২.২২ | ১০ম |
| ১৩ | ৮৫০ | ১৪৭৫ | ৭৩.৫৩ | ৪র্থ |
| ১৪ | ৮০০ | ১৩৭৫ | ৭১.৮৮ | ১১শ |
| ১৫ | ৭৫০ | ১৩০০ | ৭৩.৩৩ | ৫ম |
| ১৬ | ৭০০ | ১২০০ | ৭১.৪৩ | ১৩শ |
| ১৭ | ৬৫০ | ১১২৫ | ৭৩.০৮ | ৬ষ্ঠ |
| ১৮ | ৬০০ | ১০৫০ | ৭৫.০০ | ৩য় |
| ১৯ | ৫৫০ | ৯৭৫ | ৭৭.২৭ | ২য় |
| ২০ | ৫০০ | [illegible]০০ | ৮০.০০ | ১ম |

## ১১. ১৯৯১ সনের তুলনায় ১৯৯৭ -এ বেতন বৃদ্ধির হার

| বেতন গ্রেড | ১৯৯১ | ১৯৯৭ | বেতন বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০০০ | ১৫০০০ | ৫০.০০ | ১৩শ |
| ২ | ৮৬০০ | ১২৯০০ | ৫০.০০ | ১৪শ |
| ৩ | ৭৮০০ | ১১৭০০ | ৫০.০০ | ১৫শ |
| ৪ | ৭১০০ | ১০৭০০ | ৫০.৭০ | ১২শ |
| ৫ | ৬৩০০ | ৯৫০০ | ৫০.৭৯ | ১১শ |
| ৬ | ৪৮০০ | ৭২০০ | ৫০.০০ | ১৬শ |
| ৭ | ৪১০০ | ৬১৫০ | ৫০.০০ | ১৭শ |
| ৮ | ৩২০০ | ৪৮০০ | ৫০.০০ | ১৮শ |
| ৯ | ২৮৫০ | ৪৩০০ | ৫০.৮৮ | ১০ম |
| ১০ | ২৩০০ | ৩৪০০ | ৪৭.৮৩ | ১৯শ |
| ১১ | ১৭২৫ | ২৫৫০ | ৪৭.৮৩ | ২০শ |
| ১২ | ১৫৫০ | ২৩৭৫ | ৫৩.২৩ | ৬ষ্ঠ |
| ১৩ | ১৪৭৫ | ২২৫০ | ৫২.৫৪ | ৮ম |
| ১৪ | ১৩৭৫ | ২১০০ | ৫২.৭৩ | ৭ম |
| ১৫ | ১৩০০ | [illegible]৯৭৫ | ৫১.৯২ | ৯ম |
| ১৬ | ১২০০ | ১[illegible]৭৫ | ৫৬.২৫ | ৩য় |
| ১৭ | ১১২৫ | ১৭৫০ | ৫৫.৫৬ | ৪র্থ |
| ১৮ | ১০৫০ | ১৬২৫ | ৫৪.৭৬ | ৫ম |
| ১৯ | ৯৭৫ | ১৫৬০ | ৬০.০০ | ২য় |
| ২০ | ৯০০ | ১৫০০ | ৬৬.৬৭ | ১ম |

১২. ১৯৯৭ সনের তুলনায় ২০০৫ -এ বেতন বৃদ্ধির হার

| বেতন গ্রেড | ১৯৯৭ | ২০০৫ | বেতন বৃদ্ধির শতকরা হার | বেতন বৃদ্ধিতে অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৫০০০ | ২৩০০০ | ৫৩.৩৩ | ১৩শ |
| ২ | ১২৯০০ | ১৯৩০০ | ৪৯.৬১ | ১৬শ |
| ৩ | ১১৭০০ | ১৬৮০০ | ৪৩.৫৯ | ১৯শ |
| ৪ | ১০৭০০ | ১৫০০০ | ৪০.১৯ | ২০শ |
| ৫ | ৯৫০০ | ১৩৭৫০ | ৪৪.৭৪ | ১৮শ |
| ৬ | ৭২০০ | ১১০০০ | ৫২.৭৮ | ১৪শ |
| ৭ | ৬১৫০ | ৯০০০ | ৪৬.৩৪ | ১৭শ |
| ৮ | ৪৮০০ | ৭৪০০ | ৫৪.১৭ | ১২শ |
| ৯ | ৪৩০০ | ৬৮০০ | ৫৮.১৪ | ৭ম |
| ১০ | ৩৪০০ | ৫১০০ | ৫০.০০ | ১৫শ |
| ১১ | ২৫৫০ | ৪১০০ | ৬০.৭৮ | ২য় |
| ১২ | ২৩৭৫ | ৩৭০০ | ৫৫.৭৯ | ১০ম |
| ১৩ | ২২৫০ | ৩৫০০ | ৫৫.৫৬ | ১১শ |
| ১৪ | ২১০০ | ৩৩০০ | ৫৭.১৪ | ৮ম |
| ১৫ | ১৯৭৫ | ৩১০০ | ৫৬.৯৬ | ৯ম |
| ১৬ | ১৮৭৫ | ৩০০০ | ৬০.০০ | ৪র্থ |
| ১৭ | ১৭৫০ | ২৮৫০ | ৬২.৮৬ | ১ম |
| ১৮ | ১৬২৫ | ২৬০০ | ৬০.০০ | ৫ |
| ১৯ | ১৫৬০ | ২৫০০ | ৬০.২৬ | ৩ |
| ২০ | ১৫০০ | ২৪০০ | ৬০.০০ | ৬ |

১৩. Do you think there should be provison of Time Scale for Class II officers?

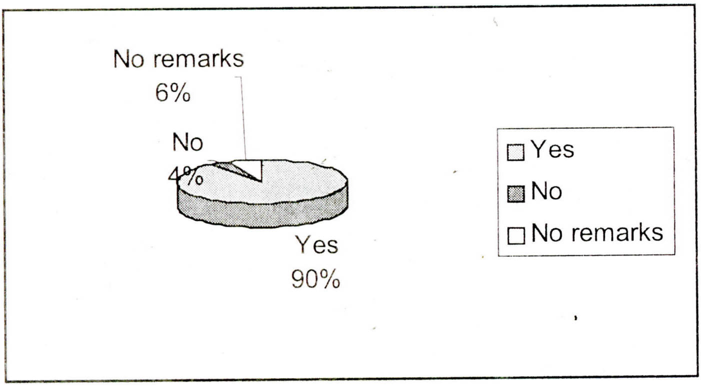

১৪. How many Time scales do you suggest for Class-II officers?

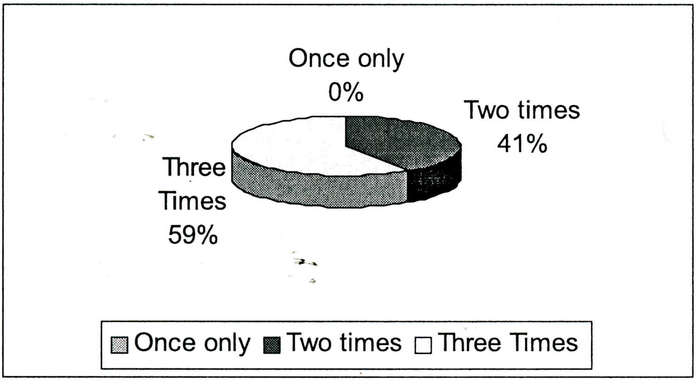


১৫. What is your educational qualification?

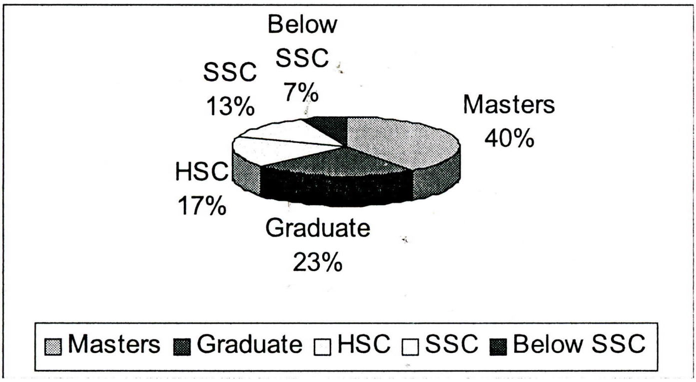


১৬. Are you directly recruited or promoted?

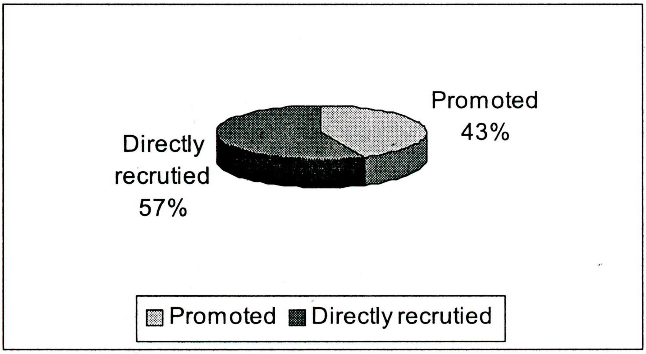

১৭. When did you take 1st training in your service?

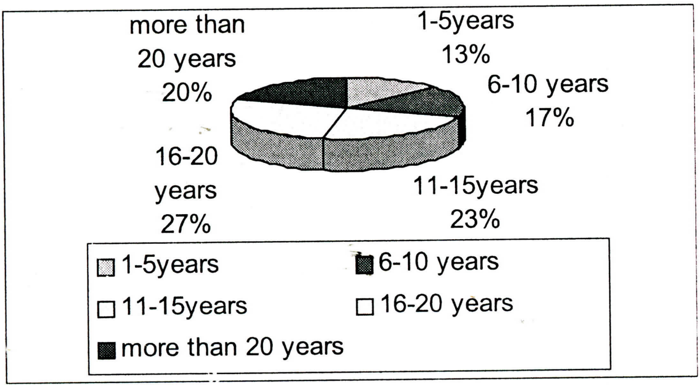


১৮. When will you get the next promotion (Possibly)?